
পথের সাথী
স্বপনবুড়ো

পথের সাথী

অঙ্কুর প্রকাশনী
সাঁইত্রিশ এ, কলেজ রো, কলকাতা-সাত লক্ষ নয়

প্রকাশ :
দ্বিতীয়, সংস্করণ :
তের শো তিরানব্বুই

প্রকাশক :
হরিনারায়ণ বসাক
সাঁইত্রিশ এ, কলেজ রো
কলকাতা-সাত লক্ষ নয়

প্রচ্ছদ :
নারায়ণ দেবনাথ

মুদ্রাকর :
শ্রীশীতল চন্দ্র রায়
আরতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
উনিশ ডি, এইচ, ষোল, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-সাত লক্ষ ছয়।

মূল্য : সাত টাকা

লেখকের নিবেদন

আমার লেখা এই কিশোর উপন্যাস "মুখ দেখে কি মানুষ চেনে ?" নামে সুখ্যাত শিশু-মাসিক "শুকতারায়" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

সেই সময়ই বিভিন্ন অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা এই লেখাটি সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করে এবং কাহিনীটি যে তাদের ভালো লাগছে সে কথা টেলিফোন ও পত্র যোগে নানা ভাবে জানায়।

পুস্তকটি প্রকাশকালে তার নাম পরিবর্তন করা হয় এবং নতুন নাম দেয়া হয় "পথের সাথী"।

নবীন প্রকাশক শ্রীমান হরিনারায়ণ ছোটদের জন্যে এই কিশোর উপন্যাস প্রকাশ করায় তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আমার দেশের অগণিত ছেলেমেয়েরা বইটি পড়ে খুশী হলে তাদের আনন্দ লেখকের মনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে।

স্বপনবুড়ো

স্বপন বুড়োর অন্যান্য বই

আধলার অ্যাড্ভেঞ্চার
প্রেতপুরী
বাবুই বাসা বোর্ডিং
ভয়ঙ্করের স্বপ্ন
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

দুটো ছেলেকে নিয়ে গোটা ইস্কুলের মধ্যে একেবারে আলাদা দুটি দল হয়ে গেল।

একদল বললে, চিত্রকের মতো কেউ ছবি আঁকতে পারে না। তুমি দশ মিনিট ওর সামনে বসে থাকো, দেখবে হুবহু তোমার ছবি এঁকে ফেলেছে। এ যোগ্যতা আর কার মধ্যে আছে শুনি?

আর একদল অমনি ফোঁড়ন কেটে বললে, আর সুরদাসের গুণের কথাটাও তোমরা না ভেবে পারবে না। অমন মধুর গলায় গান গাইতে কে পারবে শুনি? গোটা ইস্কুল খুঁজলেও একটি প্রাণীকে তোমরা খুঁজে পাবে না!

সুতরাং ছবির দল আর গানের দল আলাদা হয়ে গেল। যখন বিদ্যালয়ে বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী হয়—তখন চিত্রককে নিয়ে মাতামাতির সীমা থাকে না। সারা প্রদর্শনীর অর্ধেক ছবিই চিত্রক নিজে এঁকে দেয়। তারপর বন্ধুদের দিয়ে নানারকম ছবি আঁকায়। কেউ তাঁকে প্রাকৃতিক দৃশ্য, কেউ আঁকে ফুলের ছবি। আবার কেউ আঁকে রেলগাড়ির ছবি, মেলার ছবি বা নদীর ছবি। পাল তোলা নৌকো চলে যাচ্ছে—নদীর ওপর দিয়ে। চিত্রক এক একজনকে দিয়ে এক-এক রকম ছবি চিত্রি করে। তাতে চিত্র প্রদর্শনী ভরে ওঠে। রঙের জৌলুশ খোলে চারদিকে।

এছাড়া প্রদর্শনীর প্রচারের দিকটাও চিত্রক নিজে পরিশ্রম করে নানাভাবে, নকশার সাহায্যে গড়ে তোলে।

একটি সুন্দর তোরণদ্বার তৈরী করে। সেটা ছবি দিয়ে আর নকশা দিয়ে ভরাট থাকে।

এছাড়া অনুষ্ঠানের সভাপতি আর নিমন্ত্রিত অতিথিরা যে পথ দিয়ে আসবেন—সেখানেও বাঁশ আর রঙীন কাগজ দিয়ে মনোহর গেট তৈরী করে বাখারি দিয়ে সুন্দর সুন্দব সব নকশা সাজিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে। সভাপতি যখন আসেন—তখন তার অভ্যর্থনার জন্য সানাই বাজানো হয়ে থাকে।

আবার যখন পুরস্কার বিতরণী সভা ডাকা হয়—বিদ্যালয়ে সেই সময় গোটা ইস্কুলে সুরদাসের খাতির বেড়ে যায়।

সুরদাস নিতান্ত গরিবের ছেলে।

সে যে কোন নামকরা গায়কের কাছে রীতিমত ভাবে গান শিখেছে তা কিন্তু নয়। খুব ছেলেবেলা থেকেই ওঁর গানের গলাটা মিষ্টি আপন মনে যে সব গান শিখেছে, তাই যখন গাইতে শুরু করে তখন সারা বিদ্যালয়ে ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে। কারো মুখে একবার গান শুনলেই সুরদাস দিব্যি তুলে নিতে পারে। সে রবীন্দ্র সঙ্গীত হোক; নজরুলের বা অতুলপ্রসাদের গান হোক—কিংবা শ্যামাসঙ্গীত হোক।

বিধাতা ওকে একান্ত আদরে যে গানের গলা দিয়েছেন—তাতে সহজ ভাবে সব গানই ভালো শোনায়।

তাই সুরদাসকে চেষ্টা করে কোনো গান শিখতে হয় নি। ও যেন গানের পাখি। সকাল-সন্ধ্যায় ও যেন গান আর সুর দিয়ে ভগবানের বন্দনা গায়।

এদিক দিয়ে ভগবানের করুণা থাকা সত্ত্বেও সুরদাস আর এক দিক দিয়ে বড় অভাগা।

খুব অল্প বয়সে সে মা-বাবাকে হারিয়েছে।

এক গরিব জ্যাঠামশায়ের কাছে সে মানুষ হয়।

জ্যাঠামশাই আবার গান-টান ভালো বোঝেন না। তিনি সব সময় সুরদাসকে ডেকে বলেন, পরে তোকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে। তাহলে নিজের দুঃখ দূর হবে, আর আমার সংসারের অভাব লাঘব করতে পারবি। শুধু শুধু গান গেয়ে নিজের ভাগ্যটা কি ফেরাতে পারবি ?

সুরদাসের মন চায়—সে যেন তার গলার গানে এই আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিতে পারে।

বনের পাখি আপন আনন্দে গান গেয়ে চলে—কেউ শুনলো কি শুনলো না—সে দিকে তার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই। সুরদাস কি মনের পুলকে সেই পাখিদের দলে যোগ দিতে পারে না ?

জ্যাঠামশায়ের সংসারে সুরদাসকে অনেক কাজ করতে হয়। প্রয়োজনে হাট-বাজার করা, গৃহপালিত পশুদের যত্ন নেয়া, মাঝে মাঝে মাঠে গিয়ে—ফসলের খবরও নিতে হয়। জ্যাঠামশায়ের কিছু চাষবাসের জমি আছে। সেদিকে সুরদাসের দৃষ্টি রাখতে হয় বৈ কি।

বাইরে ঘুরে বেড়াবার এই কাজগুলো করতে সুরদাস কিন্তু মনে মনে খুশী হয়।

উদার আকাশ, সবুজ বনানী, মাথার ওপর মেঘের খেলা আর শাখে শাখে পাখির মধুর ডাকাডাকি ওকে যেন পথচলার হাতছানি দেয়।

সুরদাস আপন মনে পথ চলে আর খোলামেলা প্রকৃতির কানে কানে ওর সুর ঢেলে দেয়।

কোথা দিয়ে যে চলার পথ শেষ হয়ে যায়—ও জানতেই পারে না।

ছাগল আর ভেড়ার দল ঠুং ঠুং শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলেছে,—সুরদাস অবাক হয়ে দু'দণ্ড তাই দেখে। তারপর ওদের চলার ছন্দে গানের সুর মিশিয়ে দেয়।

নীলাকাশের বুকে সাদা বকের দল উড়ে চলেছে—তাই দেখে সুরদাসের মন উন্মনা হয়ে ওঠে। তার পথ চলার বিরতি ঘটে। কিন্তু পরক্ষণেই বলাকা দলের সঙ্গে সঙ্গে সে গান গেয়ে এগিয়ে চলে।

জেলেরা জাল ফেলছে সরোবরে, তার শব্দের সাথে সুর মেলায় সুরদাস। ঝপাং ঝপ্—ঝপাং ঝপ!!

গাভী তার বাছুরকে দূর থেকে ডাকছে—হা—ম্বা—। সুরদাস সেই মায়ের ডাকের সঙ্গেও সুর মেলাতে ভোলে না!

এমনি ভাবে সুরদাসের দিন-রাত্তির অভাবের মধ্যেও ঝিলিক দেয়ার মতো সুরের সোনালী জাল বোনে।

ওদিকে চিত্রকের বাড়ির চিত্র সম্পূর্ণ আর এক রকম। চৌধুরী বাড়ি নামেও বড় আর চেহারাতেও বিরাট।

সেখানে মস্ত বড় দালান! ঠামা জ্যাঠা—বাবা—কাকা—পিসি—মাসি—দাদা—দিদি মিলে—বাড়ি ভরতি অনেক মানুষ। কত বাগান, কত পুকুর।

বাড়িটা সব সময় লোকজনে গম্‌গম্ করতে থাকে। কত ঘর? তার ভেতর ছোট-বড়-মাঝারি কত মানুষ।

শুধু কি বাড়ির বাসিন্দা? ঝি-চাকরের দলও নেহাৎ কম নয়। বাড়ির সামনে মস্তবড় ফুলের বাগান। ধানের গোলা, গোয়াল ভরতি গাই।

সেখানে পুরোনো মালীর দল দিন-রাত খাটছে। রঙ-বেরঙের ফুল ফোটাতে তাদের দারুণ উৎসাহ। এই ফুল কিছু যায় ঠামার ঠাকুরঘরে।

তারপর মালীরা ফুলের তোড়া বেঁধে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। ছোটদের সাজানো-গোছানো খেলাঘর আছে।

সেখানেও প্রতিদিন ফুলের যোগান দিতে হয়। ছেলেমেয়ের দল, খেলাঘর সাজায়, মালা গাঁথে, পুতুলের বিয়ের আয়োজন করে। এছাড়া ঝুলন, লক্ষ্মীপূজো, সরস্বতীপূজো, দোল, দুর্গাপুজো—কিছুই বাদ যায় না ওদের।

বাড়ির মেয়েদের কত রকমারী শখ।

কেউ সেলাই করে, সোয়েটার বোনে, মাছের আঁশ দিয়ে শিব-দুর্গার মূর্তি তৈরি করে।

আবার একদল আছে—তাদের বই-বই বাতিক। আলমারি ভরতি সব গল্পের বই, ছবির অ্যালবাম, আর উপন্যাসের মিছিল। ওরা বই হাতে পেলে বুঝি ক্ষিদে-তেষ্টা ভুলে যায়।

এ বাড়িতে নতুন বই কেনারও বিরাম নেই।

আবার ডাকে নানা জাতীয় মাসিক পত্রিকা আসে।

গিন্নিদের জন্যে রঙীন সিনেমা পত্রিকা।

ছোটদের জন্যে রঙ-বেরঙের মলাট দেয়া মাসিক পত্রিকা।

বয়স্ক প্রবীণদের জন্যে সাহিত্য পত্রিকা—দর্শন—বিজ্ঞান। অভাব নেই কিছুরই।

সেই বাড়ির ছেলে চিত্রক আপন মনে ছবি আঁকবে—এর মধ্যে অবাক্ হবার কিছু নেই।

না চাইতেই আসে। নানা জাতের রঙ,—রকমারি তুলি—আর ছোট বড় মাঝারি ড্রইং খাতা—

যত খুশী ছবি এঁকে হাত পাকাও।

ঠামা এসে বলে, ওরে চিতু, আমাকে একটি রাধাকৃষ্ণের মূর্তি এঁকে দিস—

কাকা বলে, ওরে চিত্তির, আমাদের কলেজে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হবে। খুব বড় করে একটি রবীন্দ্রনাথের ছবি এঁকে দিস।

কাকীমা বলে, আমি সিল্কের কাপড়ের ওপর বিবেকানন্দের বাণী সেলাই করবো। বিবেকানন্দের ছবি আর সেই সঙ্গে তাঁর বাণীটা বেশ মানানসই করে এঁকে দিস ত!

মেজদির ফরমাস আবার অন্যরকম।

তার সখির বিয়ে—একটা উপহার দিতে হবে।

চলতি উপহার মেজদি কিছুতেই দেবে না। এই মেজদির অনেক গুণ। সবাইকে লুকিয়ে মেজদি আবার খাতার পাতায় কবিতা লেখে।

তার সখির বিয়ে উপলক্ষে একটা দারুণ কবিতা লিখে ফেলেছে। তাতে চাঁদ আছে, পাখি আছে, ফুল আছে—আর আছে ছন্দের মিল। তরতর করে নদী বয়ে যাচ্ছে—নৌকো দুলছে—

সবটা মিলিয়ে চিত্রককে লোভনীয় চিত্র এঁকে দিতে হবে। সেই ছবি বাঁধাই করে মেজদি সখির বিয়েতে উপহার দেবে।

এতে বন্ধুমহলে নতুনত্বও হবে, আবার নামও হবে। এছাড়া বন্ধুদের অনুরোধ ত অফুরন্ত।

কাজেই এত ছবি এঁকে চিত্রক সময় পাবে কখন? এছাড়া ক্লাসের পড়া আছে—ইস্কুলে নানা প্রতিযোগিতা আছে,—খেলার মাঠে হাজিরা দেয়া আছে।

মাঝে-মধ্যে বন্ধুরা কেউ যদি সুরদাসের গানের কথা তোলে—ত' প্রথমটা সে কোনো কথাই বলে না, চুপচাপ থাকে।

বার বার জিজ্ঞেস করলে ঠোঁট বাঁকিয়ে জবাব দেয় হুঁ! ওটা আবার একটা কাজ নাকি? শুধু শুধু সময় নষ্ট। তার চাইতে

সুরদাসকে খেলার মাঠে আসতে বল। শরীরটাকে শক্ত করুক। তা হলেই জীবনে অনেক দরকারী কাজ করতে পারবে।

চিত্রকের সঙ্গে সুরদাসের সামনা-সামনি কোনো কথাবার্তা হয় না। শুধু বন্ধুর দলই ইন্ধন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখে এই আগুন ওরা যেন কিছুতেই নিভতে দেবে না। এ আগুন উত্তেজনার আগুন।

যত দাউ দাউ করে জ্বলে—
শিখা লক-লক করে আকাশে ওঠে—
ততই ছেলের দল খুশী হয়।

এর মধ্যে চিত্রকের জন্মদিনের উৎসব এসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমহলে হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল।

একদল প্রস্তাব করলে, চিত্রকের জন্মদিনে নাটক অভিনয় করতে হবে। এক এক জনের এক এক পার্ট। রকমারী সাজপোশাক। সে ভারী জম-জমাট ব্যাপার হবে।

আর এক দলের বায়না—নৌকো করে নদীর বুকে বেড়াতে যেতে হবে। সারাদিন ধরে চলবে শুধু আবৃত্তি, ম্যাজিক, কৌতূক আলেখ্য হরবোলার ডাক—আর সেই সঙ্গে প্রচুর খাওয়া দাওয়া।

আর একজন ফোড়ন কাটল, কিন্তু গান? নদীর বুকে নৌকোয় পাল তুলে দিয়ে ভাটির টানে গান কিন্তু জমবে ভালো।

চিত্রক কি সুরদাসকে নিমন্ত্রণ করবে?

কেউ জোর করে কিছু বলতে পারে না।

সবাই চিত্রকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

*

* *

গ্রামের বাইরে নদীর ধারে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে কয়েকটি ছেলের জটলা চলছিল। বিকেলের পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

ভঞ্জ বললে, তোরা শুনেছিস,—চিত্রকের জন্মদিনে ক্লাসের সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, কিন্তু একমাত্র সুরদাসকে বাদ দিয়ে।

বিপুল অবাক হয়ে কইলে, না—না, সে রকম ত কিছু শুনি নি। আমরা ত জানি ক্লাসের সব ছেলেকেই নেমন্তন্ন করা হয়েছে।

অভয় ফোড়ন কেটে বললে, হ্যাঁ, তুই সব জানিস। প্রত্যেক ছেলের হাতে নাম লিখে একটি করে কার্ড দেয়া হয়েছে। কিন্তু সুরদাসের নামে কোন কার্ড আসে নি।

সবাই অবাক্ হয়ে বললে, তাই নাকি? এ ত ভারী মজার ব্যাপার।

ছোটাই টিপ্পনি দিয়ে কইলে, এটা মজার ব্যাপার হল? ইচ্ছে করে সুদাসকে অপমান করা হল না?

সুরদাস কিন্তু ব্যাপারটাকে গায়ে না মেখে হাসতে হাসতে কইলে, আরে ভাই যেতে দে। আমি গরিব মানুষ। জ্যাঠামশায়ের সংসারে মানুষ হচ্ছি। আমাদের হচ্ছে নিতান্ত কষ্টের জীবন। বড়লোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন হলে খুবই বিপদে পড়তাম আমি।

কেন?—কেন?

সবাইকার উৎসুক প্রশ্ন।

সুরদাস হাসতে হাসতে উত্তর দিলে' একটা ফরসা জামা নেই। আবার কাপড়টাও ছেঁড়া। নেমন্তন্ন পেলে কি বিপদে পড়তাম বল ত! আমায় বড়লোকের বাড়ির দাড়োয়ান ঢুকতেই দিত না। ভাবত এক ব্যাটা ভিখিরি খাবারের লোভে এসে জুটেছে—

সন্তা মাথা ঢুলিয়ে আপন মনে কইলে, কিন্তু গান? চিত্রকের জন্মদিনে সুরদাস যদি গান গাইত—তাহলে আসর একেবারে জমে যেত না? ওরা একদম বোকা, তাই সুরদাসকে নেমন্তন্ন করে নি। চিত্রক এটা খেয়াল করে নি যে, সুরদাস একাই একশ।

ভঞ্জ আবার ভঙ্গী করে কইলে, ওরা যদি গান না ভালোবাসে তবু সুরদাসকে নেমন্তন্ন করতে হবে? ওরা জানে নেমন্তন্ন করলে সুরদাস পোষাকের জন্য বিপদে পড়বে। তাই কায়দা করে সময় থাকতে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—

সন্তা আগের মতোই মাথা ঢুলিয়ে উত্তর দিলে—না হয় আমরাই

জামা-কাপড় ধার দিতাম—তাই বলে এ কেমন ভদ্রতা যে, ক্লাসের একটি ছেলেকে বাদ দেবে ?

ছোটাই চোখ মট্‌কে উত্তর দিলে, আসল কথাটা কি জানিস ? এ হচ্ছে হিংসে। সুরদাসের গান শুনলে সবাই তারিফ করবে, আরো গাইবার জন্য অনুরোধ করবে—সেটা চিত্রকের সহ্য হবে না।

সুরদাস প্রবল আপত্তি জানিয়ে কইলে, না—না, আসল কারণ তা নয়। আমি ত কোন উপহার দিতে পারবো না। মিছিমিছি একটা সঙের মত গিয়ে লাভ কি ? তোরা ত সবাই ভালো ভালো উপহার নিয়ে গিয়ে হাজির হবি। আমি ওখানে গিয়ে কি করবো শুনি ?

সন্‌তা উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলে, গান শোনাবি, আবার কি ? গানটা কি সত্যিকারের অমূল্য উপহার নয় ?

—ওদের কাছে যদি গানের কোন দাম না থাকে ?

দাঁত বের করে অভয় টিপ্পনী কাটলো,—গান ঠিকই হবে দেখিস। জন্মদিনের আসরে গান হবে না—এ কখনো হতে পারে ? হয়ত গাইবে ওদের হোঁদল-কুত-কুত এক ভাই কি বোন,—যার দারুন বেসুরো গলা। সেই গান শুনেই ওরা মোহিত হবে, অরে ক্রমাগত হাততালি দিতে থাকবে।

ঠিক—ঠিক—ঠিক !

চারিদিক থেকে কান-ফাটা কোলাহল উঠল।

ভঞ্জ তখন সবাইকে থামিয়ে দিয়ে কইলে, তার চাইতে এখন আমরা সুরদাসের একটা গান শুনি।

সন্‌তা কবিত্ব করে কইলে—এমন সময়—যখন বিকেলের পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। নদীর ওপর দিয়ে ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়া বইছে, —নীল আকাশে পাখির দল তাদের নিজ নিজ নীড়ে ফিরে যাচ্ছে—

ছোটাই সন্‌তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, যখন নদীর পারে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা রাজছে, আর যখন মাথার ওপর দিয়ে মেঘের ভেলা অলস-মন্থর গতিতে ভেসে যাচ্ছে—সেই সময় আমরা সুরদাসের কণ্ঠের সুন্দর গান শুনতে চাই—

সবাই একযোগে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল—

—সাবাস—সাবাস—

—এই ত গান গেয়ে সন্ধ্যারতির সুন্দর সময়—

—হ্যাঁ সুর আর ছন্দ নিয়ে ভগবানের আরতি করা।

সুরদাস শুধোলে, অনেক কিছু ত তোমরা বললে—আর আমিও মন দিয়ে সব শুনে গেলাম। এখন তোমরা বল, কি গান আমি গাইব?

একজন বললে--'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর, আমারি সাধের সাধনা—"

আর একজন ফরমাশ করলে—"আমায় নিয়ে যাবি কেরে—দিনের শেষের শেষ খেয়ায়—?"

অপর একটি ছেলে আবদার ধরলে—"আমারি এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো—"

সুরদাস খুশী হয়ে মন্তব্য করলে, তোমরা যে গান ভালোবাসো—তা তোমাদের এই গানের নির্বাচন দেখেই বেশ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তোমাদের আমি এই তিন খানি গানই শুনিয়ে দেবো। কেননা, তোমাদের এই ফরমাসী গানগুলি আমারও খুব প্রিয়।

সুরদাসের কথা শুনে ছেলের দল ভারী খুশী। সবাই তখন ওকে ঘিরে গাছের তলায় শান্ত হয়ে বসে পড়ল।

অনেকগুলি পালতোলা নৌকা দাঁড় টেনে নদীর বুকের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। নৌকার মৃদু প্রদীপের ছায়া গাঙের জলে পড়ে এক সুন্দর শোভার সৃষ্টি করেছে।

মৃদু সন্ধ্যাসমীরণে অশ্বত্থের পাতাগুলি ঝিরঝির করে কাঁপছে। দু'একটি করে পাতা ওদের মাথার ওপর দেবতার আশীর্বাদের মতো খসে পড়ছে।

এমন সময়ে আকাশ-বাতাসে যেন একটা অনন্তের আহ্বান।

এই অনাবিল আনন্দধারায় অবগাহন করে সুরদাস তার মধু-কণ্ঠের গান শুরু করল। সমস্ত প্রকৃতি রানী যেন স্তব্ধ হয়ে বসে তার সেই মন লাগানো গান শুনতে লাগল।

প্রথমে—"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুন্দর—"

তারপর—"আমায় নিয়ে যাবি কেরে দিনের শেষের শেষ খেয়ায়।"

সবশেষে—"আমারি এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালে।"

পর পর এই তিনটি গান সুরদাস বন্ধুদের অনুরোধে গেয়ে শোনালো।

গান শুনে সবার মনে হল, তাদের আত্মা তৃপ্ত আর মন আনন্দরসে ভরপুর।

অনেকক্ষণ ধরে কেউ কথা বলল না।

এমন এক একটা সময় আসে—যখন কথা বলার চাইতে নীরব হয়ে থাকলে—মনের আন্তরিক আকুতি বেশী প্রকাশ করা হয়।

ছোটাই এইবার সেই নীরবতা ভেঙে ফেলল। বললে, চিত্রকের জন্মদিনের সন্ধ্যার আসরে যদি এই গানগুলো গাওয়া হত, তা হলে কেমন জমে যেত বল ত?

সুরদাস মৃদু হেসে বললে, ছোটাই এই ব্যাপারে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে এম মত নই।

—কেন? কেন? সবাইকার কৌতূহলী প্রশ্ন।

সুরদাস জবাব দিলে, দেখ ভাই, গান অনেক সময় জমে যায় তার পরিবেশের গুনে। চিত্রকের ড্রইং রুমে লোকজনের কোলাহল থাকত। ফিস্‌ফিস্ কথা থাকত। অনেকে হয়তো অবান্তর কথা বলত। আর সব চাইতে যেটা বলবার—সেটা হচ্ছে ওখানে অশ্বত্থ গাছের পাতার ঝিরঝিরে শব্দ থাকত না। নদীর কলতানের অভাব হত। নীল আকাশের বুকে মেঘের খেলা আর পাখির আনাগোনা থাকত না। এইগুলো বাদ দিয়ে গানের ভেতর কি প্রাণের সঞ্চার হয়?

ভঞ্জ মাথা নেড়ে কইলে, সে কথা কিন্তু সত্যি।

সন্তা কিন্তু এসব কবিত্বের কথা মানতে রাজী নয়। সে মাথা তুলিয়ে আপত্তি জানিয়ে বললে, তাই বলে, ক্লাসশুদ্ধ সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে—মাত্র একটি বন্ধুকে বাদ দেয়ার মধ্যে যে নীচতা আর অভদ্রতার ইঙ্গিত রয়েছে, আমি তাকে কোনোমতেই সমর্থন করতে

পারি না। গান হোক বা নাই হোক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ ভালোবাসার সম্পর্কে নষ্ট হয়ে যাবে কেন ? তা হলে ত মানুষের সমাজ থেকে দূরে গিয়ে বনে-জঙ্গলে বাস করলেই হয়।

ছোটাই বললে, আমরা ইস্কুলে পাশাপাশি বসে পড়া তৈরী করি। সেই একসঙ্গে ওঠা-বসার ভেতর দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব জমে ওঠে। একজনের বিপদে আমরা সবাই মিলে পাশে এসে দাঁড়াই। কারো অসুখ করলে আমরা দল বেঁধে রাত জেগে সেবা-শুশ্রুষা করি। এর কি কোনো দাম নেই ?

ভঞ্জ উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলে, তা হলে কি করতে বলো তোমরা? আমরা কি দল বেঁধে চিত্রকের জন্মদিনের উৎসব বয়কট করবো ?

সুরদাস সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে বললে—না—না, কখনই নয়। তোমরা কখনই এ মনোভাব মনে স্থান দেবে না। আমাদের একজন বন্ধু—সে জন্মদিনের উৎসব করতে বসেছে। ভগবান তাদের প্রচুর ঐশ্বর্য দিয়েছেন—সেটা ঈশ্বরেরই আশীর্বাদ। তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব মা-বাবা দাদা-দিদি সবাই মিলিত হয়ে আনন্দ করবে। সেই আনন্দলোকে তোমাদের আমন্ত্রণ এসেছে। আমি এক হতভাগ্য-লক্ষ্মীছাড়া মানুষ। তোমারা আমার কথা ভেবে এই জন্মদিনের উৎসবকে পণ্ড করে দিও না। বরং আমি আমার গাছে ফোটা একটি ফুল তোমাদের হাতে দিয়ে দেবো। এই অক্ষম বন্ধুর সেই অকিঞ্চিৎকর উপহার তার হাতে তুলে দিও।

সুরদাসের এই মধুর ব্যবহার দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। উৎসবের দিন সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুর দল সবাই মিলে চিত্রকের আলো ঝলমল ভবনে গিয়ে উপস্থিত হল।

ওরা এগিয়ে গিয়ে সুরদাসের দেয়া ফুলটি চিত্রকেরহাতে তুলে দিয়ে বললে, এটা সুরদাসের আন্তরিক উপহার। তুমি হাতে তুলে.নাও।

মুহূর্তের মধ্যে চিত্রক যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে চোখ পাকিয়ে বললে, সুরদাস আমাকে অপমান করতে চায় ? কিন্তু সেই ভিখিরিটাকে আমি মানুষ বলেই মনে করি না।

এই বলে বন্ধুর দেয়া সেই ফুলটি সবার সামনে মাটিতে ফেলে দিয়ে দু পায়ে মাড়াতে লাগল।

তারপর কোথা দিয়ে যে কী ঘটল, কেউ বলতে পারে না। ব্যাঙের ডাক শেয়ালের ডাক, কুকুরের চিৎকার শুরু হয়ে গেল চারিদিক থেকে। একটি ছেলে গান গাইছিল। তার হেঁড়ে গলা ছাপিয়ে ব্যঙ্গের হাসি উঠল চারিদিক থেকে।

সে এক দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার!

বন্ধুরা মরিয়া হয়ে সব কিছু আয়োজন পণ্ড করে দিলে। রঙীন কাগজের শেকল ছিঁড়ে, ফুলের মালাগুলো টেনে ফেলে দিয়ে, মোমবাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ে একদল ছেলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল।

বহু খাবার নষ্ট হয়ে গেল।

যেখানে জন্মদিনের আনন্দ উল্লসিত হয়ে উঠলে—সেখানে সহসা শ্মশানের নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। আনন্দের সানাই বাজতে বাজতে থেমে গেল।

*

* *

সারা গাঁয়ে একটা থমথমে ভাব চলেছে।

একটা গোলযোগ কিংবা মন কষাকষি শুরু হলে, সঙ্গে সঙ্গে বহু পরামর্শদাতা এসেও জোটে।

তেমনি চিত্রকদের বাড়িতেও বহু শুভানুধ্যায়ী আর পরামর্শদাতা এসে হাজির হল।

তারা সবাই উত্তেজিত হয়ে জানালো, প্রধান শিক্ষকের কাছে ছেলেদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে হবে। আর তারা যাতে কঠোর শাস্তি পায় তার জন্যে সকল রকমে তদ্বির করতে হবে।

কে কে দলবদ্ধভাবে ইস্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ জানাবে তার জন্যে একটা কমিটিও গঠন করা হল।

কিন্তু চিত্রকের ঠাকুর্দা ইতিমধ্যে সব কথা জেনে সেই অতি উৎসাহী পরামর্শদাতাদের ডেকে পাঠালেন।

তিনি শান্তভাবে গড়গড়ার নল টানতে টানতে বললেন, দেখ, উত্তেজিত হয়ে কোন কাজ করা ঠিক হবে না। এই যে তোমরা দল বেঁধে হেডমাস্টারের কাছে নালিশ জানাতে যাচ্ছ, তার আগে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে হবে—আসলে দোষটা কার ? আমি চুপ করে বসে নেই। আগাগোড়া সব খবর আমি নিয়েছি। দোষটা ত আসলে চিত্রকের। সে সব বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছে, কিন্তু একজনকে ইচ্ছে করে বাদ দিয়ে তাকে অপমান করেছে। এটা আদৌ ঠিক হয় নি। ক্লাসের ছেলে সবাই সমান। যদি কাউকেই নেমন্তন্ন করা না হত তাহলে ত ল্যাঠা চুকেই যেত। কিন্তু একজনকে বাদ দিয়ে একটা ঈর্ষার ভাব জাগিয়ে তোলা হয়েছে। তবু আমি সেই গরিব ছেলেটির কথা ভাবছিলাম। অসীম তার ধৈর্য। সে কিন্তু নিজে উত্তেজিত হয় নি। বরং তার বাগানের ফুল পাঠিয়ে দিয়েছে চিত্রককে। চিত্রক কেন সেই উপহার পায়ে মাড়িয়ে ফেলে গালাগাল দিল! জন্মদিনের উপহার যত সামান্যই হোক, তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে।

যাঁরা নালিশ জানাবার জন্যে কোমর বেঁধেছিল, তাদের বিপুল উৎসাহে যেন একেবারে শীতল জল ঢেলে দেওয়া হল।

এই বৃদ্ধের যুক্তির কাছে কেউ আর মুখ তুলতে আদৌ সাহস পেল না। ধীরে ধীরে বাড়ির কর্তার কাছ থেকে সরে এলো।

একটা দারুণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু তার শেষ পরিণতি দেখে সবাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে মাথা নীচু করে সরে পড়ল।

কিন্তু চিত্রকের দলের ছেলেরা চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। চিত্রকের জন্মদিনে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তার পাল্টা প্রতিশোধ নেবার জন্যে ওরা ভেতরে ভেতরে তৈরী হতে থাকল।

কিন্তু একটা সুযোগ না পেলে ত কিছু করা যায় না। তাই ওরা ওরা কুকুরের ঘ্রাণশক্তি নিয়ে ছোক্‌ছোক্ করে বেড়াতে লাগল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর স্থানীয় 'সঙ্গীত সম্মিলনী' একটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করল।

বয়স্ক গায়কদের মধ্যে যেমন গানের প্রতিযোগিতা হবে, তেমনি

ইস্কুলের ছেলেদের ভেতরও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হল। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, ভজন, লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল আর অতুলপ্রসাদের গান—সব বিষয়েই প্রতিযোগীরা নাম দিতে পারবে।

সুরদাসের দলের ছেলেরা বললে, এইবার তুমি নিজেকে তৈরী করে করে নাও সুরদাস। আমরা গানের প্রতিযোগিতায় তোমার নাম দিয়ে দিয়েছি। কাজেই পুরস্কার তোমাকে জয় করে আনতেই হবে।

সুরদাস শুনে অবাক্ হয়ে উত্তর দিল, তোরা করেছিস কি? জ্যাঠামশায়ের ফসলের মাঠে ঘুরে বেড়াবো, না গানের গলা সাধব? যারা দিনরাত তালিম দিতে পারে গান গেয়ে পুরস্কার পাবে তারাই। গরিবের ঘোড়া-রোগ পোষায় না বুঝলে?

কিন্তু বন্ধুরা সে যুক্তি শুনতে চায় না।

তারা বলে, গান যে জানে সে নৌকা চালাতে চালাতেও গান গাইতে পারে। নইলে ভাটিয়ালি গান তৈরী হল কি করে? ওসব ওজর আপত্তি আমরা কিছুই শুনছি না। এইবার আদাজল খেয়ে গানের সুরে ভেসে পড়ো। হাতে কাজ করবে, আর গলায় গান গাইবে। মাঠে-ঘাটে--বন-বাদাড়ে, নদীর ধারে গাইতে ত আরো সুবিধে। আশে পাশে তোমাকে বাধা দেবার কেউ থাকবে না।

সুরদাস ভেবে দেখলে, সে সত্যি।

জ্যাঠামশায়ের উঠোনে দাঁড়িয়ে গান গাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। তার চাইতে খেত-খামার দেখতে দেখতে, হাটে-বাজারে যেতে যেতে, ছাগল গরু চরাতে চরাতে মনের আনন্দে গলা খুলে গান গাওয়া অনেক বেশী সহজ। বন্ধুরা যখন কিছুতেই ছাড়বে না, তখন সে এই সোজা পথ ধরেই সুরের রাজ্যে ঢোকবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তারপর কপালে যদি না থাকে, সে কি করতে পারে?

একদিন গান গাইতে গাইতে সুরদাস হাটের পথে রওনা হয়েছে। হপ্তার অনেক কিছু সওদা আনতে হবে। কাজেই চলার গতি একটু বাড়িয়ে দিতে হয়েছে। মুখে কিন্তু গান চলছে—

"পথের পথিক করেছ আমারে,
সেই ভালো ওগো সেই ভালো,
আলোয় জ্বালালে প্রান্তরভালে
সেই আলো মোর সেই আলো।"

সুরদাস আপন মনে গান গেয়ে এগিয়ে চলেছে—

পথের পাশ থেকে এক বুড়ী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল—ওগো ছেলে,একবারটি এখানে শুনে যাও।

সুরদাস অবাক্ হয়ে থমকে দাঁড়ালো। শুধালে, কিগো ঠাকুমা তুমি কি আমায় ডাকছ?

বুড়ী আর একটু এগিয়ে এসে কইলে—হ্যাগো বাছা, তোমাকেই ডাকছি। একবারটি শুনে যাও।

সুরদাস ভাবলে, বুড়ীর তিন কুলে বুঝি কেউ নেই। তাই বোধ করি হাট থেকে কিছু সওদা করতে দেবে।

সুরদাস আবার শুধোলে, তা ঠাকুমা, তুমি হাট থেকে কিছু আনতে বলছ আমায়?

বুড়ী উত্তর দিলে, না গো বাছা, কেনাকাটা-করবার মানুষ যে ছিল, আমার বুক খালি করে পালিয়ে গেছে। আর কার জন্যে হাটে সওদা করতে পাঠাবো? সে জন্যে নয় বাছা, ঘরের ভেতর থেকে তোমার গলার গান শুনলাম। আমায় ছেলেটাও সব সময় এই গান গাইত—

"পথের পথিক করেছ আমারে, সেই ভালো ওগো সেই ভালো।"

তুমি একটু আসবে আমার উঠোনে? ওই গানটা একবার আমায় শোনাবে? আমার বুকটা দিন-রাত্তির একেবারে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। তোমার গলায় ওই গানটা যদি একবার শুনি তাহলে আমার ছেলেটার কথা মনে পড়বে। আহা! জোয়ান ছেলে ছিল আমার। কী যে তাকে কাল-ব্যাধিতে ধরল, কিছুতেই বাছা আমার বাঁচলো না। শেষকালেও তার মুখে ওই গান—

"পথের পথিক করেছ আমারে—"

বুড়ীর কথা শুনে সুরদাস একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। বুড়ীর

হাতটা ধরে কইলে, চল ঠাকুমা, আমি তোমায় গান শোনাবো।

দুইজনে মিলে ধীর পায়ে বুড়ীর উঠোনে ঢুকে পড়ল। বুড়ী বললে, একটু দাঁড়াও বাছা, আমি তোমার বসবার জন্যে একটি মোড়া এনে দিচ্ছি। বুড়ী মোড়া আনতে গেল।

সুরদাস চারদিকে তাকিয়ে দেখলে, উঠোনের এক কোণে শশার মাচা, আর এক দিকে লাউয়ের মাচা। বেশ কচি শশা আর কচি লাউগুলি মাচা থেকে ঝুলছে। দেখে মনে হল, একজন খুব যত্ন করে এইসব ফল ফলিয়েছে!

ততক্ষণে বুড়ী একটা ছোট মোড়া নিয়ে এসে হাজির! ওকে মাচার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিষণ্ণ মুখে বললে, ও, তুমি শশার মাচা আর লাউয়ের মাচা দেখছ বুঝি? এ সব সেই আমার দামাল ছেলেটার কাণ্ড। দিনরাত হাতে কাজ চালাতো, আর মুখে শুধু গান গেয়ে চলতো। কখনো মুখ বন্ধ করত না।

সব সময় বলত, হাতেই কাজ, মুখেই গান,
তবেই কাজে আসবে প্রাণ॥

সবই আমার ভাগ্যি। নইলে ওই জোয়ান ছেলেটা আমার বুক খালি করে এমনভাবে পালিয়ে যাবে কেন?

একটুখানি থেমে চোখের জল মুছে বুড়ী আবার বললে, ওই গান আমি শুনব, কিন্তু তোমার ত ধূলো পায়ে বিদায় দিতে পারি না! তুমি আরাম করে এই মোড়ায় বোসো। এই মোড়াটাও আমার ছেলের হাতে তৈরি। ওর হাতের তৈরি সব জিনিস ফেলে গেছে আর আমার বুকে শেল দিয়ে নিজে কেমন পালিয়ে গেল! এখন এই শূন্য পুরীতে কি নিয়ে আমি থাকবো বল? আচ্ছা একটু বোসো তুমি। আমি যাবো আর আসব। বুড়ী আমার ঠুকঠুক করে ঘরের ভেতর চলে গেল।

খানিক বাদেই বুড়ী আবার ফিরে এলো। এক ধামা মুড়ি ওর হাতে। আর একটা বাটিতে শশার কুচি। বুড়ি আপন মনেই কইলে, সে সর্বনেশে ত নিজে খেয়ে গেল না, এখন তুমি যদি মুখে দাও, তাহলে আমি মনে খানিকটা শান্তি পাবো।

বুড়ীর কাতর মিনতিতে সুরদাস আর আপত্তি করল না। মুড়ি আর শশা খেলে শোকাতুরা বুড়ীর মনে যদি এতটুকু শান্তি জাগে, তাহলে মিছিমিছি বাধা দিয়ে লাভ কি ?

সুরদাস চুপচাপ মোড়ায় বসে আপন মনে মুড়ি আর শশা খেতে লাগল। বুড়ী দেখে দেখে যেন চোখ ফেরাতে পারে না। যেন তার ছেলেই বসে বসে খাচ্ছে। পরম তৃপ্তি পেল বুড়ী। সুরদাসের মুড়ি খাওয়া হয়ে গেলে বুড়ী আবার তার কুঁড়েঘরের ভেতর ঢুকে গেল। দুটো নারকেল নাড়ু দিয়ে আবার ফিরে এলো। বললে, এই নাড়ু খেয়ে এক ঘটি জল খাও বাছা, পেটটা ঠাণ্ডা হবে।

সুরদাস বুড়ীর কোনো কথায় আপত্তি জানালো না। শান্ত সুবোধ ছেলের মতো সব অনুরোধ মেনে চললো। আর তা ছাড়া অনেকটা পথ হেঁটে এসে সুরদাসের বেশ খিদে পেয়েছিল।

কাজেই সুরদাসের এখন বেশ ভালই লাগছিল। সে বুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তাহলে এখন তোমাকে গান শোনাই ঠাকুমা ?

বুড়ী মাথা নেড়ে জবাব দিলে, এইবার বাছা তুমি গাও, আমি শুনি।

সুরদাস তখন চোখ বন্ধ করে মনের সকল দরদ মিশিয়ে সেই পুরোনো গান ধরলে—

“পথের পথিক করেছ আমারে
সেই ভালো ওগো সেই ভালো,
আলেয়া জ্বালালে প্রান্তরভালে।
সেই আলো মোর সেই আলো॥”

বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রাণের আবেগ দিয়ে গানখানি গাইল সুরদাস।

তারপর চোখ চেয়ে দেখলে, বুড়ীর দুই নয়নে জলের ধারা। বুড়ীর ঠোঁট দুটি কাঁপছে, মাথাটা বুকের কাছে একটু নীচু হয়ে এসেছে। আর দুই চোখ দিয়ে অঝোরে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। বুড়ী যেন নীরব নিথর।

এই ব্যাপার দেখে সুরদাসের দুই চোখও জলে ভরে উঠল। গান

শুনে যে এমন করে কেউ কাঁদতে পারে, সুরদাস আগে কখনো দেখেনি।

গান গাওয়ার পুরস্কার ও যেন পেয়ে গেল।

বুড়ীকে আর না ডেকে চুপি চুপি পা টিপে টিপে সুরদাস বুড়ীর শান্ত শীতল উঠোন থেকে বেরিয়ে গেল।

সামনের আকাশে তাকিয়ে দেখলে, সন্ধ্যাতারাটা সেখানে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

*

* *

অবশেষে সেই সঙ্গীত প্রতিযোগিতার নির্ধারিত দিন এসে উপস্থিত হল।

প্রথম দিন বয়স্ক লোকদের কণ্ঠসঙ্গীত।

আশেপাশের অনেক অঞ্চল থেকেও গায়করা এসেছে এই সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে।

স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সুন্দর তোরণদ্বার দিয়ে সাজানো হয়েছে। বেশ বড় করে মঞ্চ সাজানো হয়েছে। গায়ক-বাদকের দল বেশ আরাম করে যাতে মঞ্চের ওপর বসতে পারে তার আয়োজন করা হয়েছে।

বিচারকরা এসেছেন, শহর অঞ্চল থেকে গুণীজনের দল। বহু প্রবীণ গায়ক এই প্রতিযোগিতায় বিচারের কাজ সমাধা করতে এসেছেন।

প্রথম দিনের প্রতিযোগিতা বয়স্ক গায়কদের মধ্যে বেশ সুন্দর ভাবেই সম্পন্ন হয়ে গেল। সবাই যে ভালো গাইলেন তা নয়, তবে মোটামুটি সকলেই যে গানের চর্চা করছেন আর তাঁদের ভেতর নিষ্ঠা আছে, সেটা মোটামুটি বোঝা গেল।

দ্বিতীয় দিন মহিলাদের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছোট-বড় মিশিয়ে মহিলাদের সংখ্যা খুব বেশী হয় নি।

কিন্তু তাদের সুকণ্ঠের সঙ্গীত শুনে শ্রোতারা খুশী হয়েছেন বলেই মনে হল। এর পরের দিন যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতিযোগিতা।

কেউ বাজালেন সেতার, কেউ এসরাজ, কেউ বেহালা। মেয়েদের মধ্যে অনেকে গিটার বাজিয়ে শোনালেন।

এই অনুষ্ঠানের বিচার করতে আলাদা একদল বিচারক এসেছিলেন। এই দিনে তবলা লহরার বিচারও হল।

সকলের শেষের দিন নির্ধারিত ছিল ছোটদের অন্য। তার মানে ইস্কুলে পড়ে এমন সব ছেলেমেয়েদের জন্যে।

এই দিনের প্রতিযোগীর সংখ্যা খুব বেশী হয়েছিল। আশেপাশের অনেক বিদ্যালয় থেকে ছেলেমেয়েরা এই দিন সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে এসেছিল।

তাদের কলরবে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল। দূর-দূর অঞ্চল থেকে অনেক অভিভাবক আর অভিভাবিকাও এসেছিলেন।

প্রতিযোগী বেশী বলে এই দিনের পুরস্কারের সংখ্যাও অনেক বেশী ছিল।

সুতরাং আয়োজন, অনুরাগ আর সেই সঙ্গে এই দিনের উল্লাসও অনেক অধিক ছিল। কোলাহলও জমে উঠেছিল। এদিন স্থানীয় শ্রোতার সংখ্যাও অনেক বেশী হয়েছিল। এমন কি হাট ফেরত লোক, ঘাটের মাঝি, আর দোকান-পশারের মানুষ এবং ব্যাপারীরাও এসে ভিড় জমিয়েছিল।

স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাও দলে দলে এসে হাজির হয়েছিল। এর মধ্যে সুরদাসের অনুরাগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়।

যারা দূর দূর অঞ্চল থেকে নৌকো করে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে এসেছিল, তাদের নাম আগে ডাকা হচ্ছিল। কারণ তাদের আজ রাত্রেই ফিরে যেতে হবে।

মেয়েদের বেশ সুকণ্ঠ বলা চলে। তারা নিজেরাই তানপুরা বাজিয়ে গান গাইছিল।

সেই তুলনায় ছেলেদের গলা একটু অপটু কিশোর বয়সে এই বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের গলা থেকে দু-তিনটে করে স্বর বেরোয়। তাতে গান গাওয়া খুবই অসুবিধাজনক। কণ্ঠটা ঠিক গান গাওয়ার উপযোগী

থাকে না। আবার বয়েস একটু বেশী হলে এই অসুবিধেটা দূর হয়ে যায়। গান গাইতে গিয়ে অনেক কিশোর বালক এই অসুবিধায় পড়ছিল।

যাই হোক, প্রতিযোগিতায় উত্তেজনা ছিল। কিন্তু কেউ গান গাইবার সময় চিৎকার করে নি, কিংবা কথা বলে নি।

অবশেষে স্থানীয় শিল্পী হিসেবে সুরদাসের নাম ঘোষণা করা হল।

এ অঞ্চলে সুরদাসকে সবাই চেনে, আর তার গান ভালোও বাসে সকলে।

সুরদাস মঞ্চে উঠে সবাইকে প্রণাম করে ধীরে ধীবে তার গান শুরু করলে।

ছেলেদের বিভাগে যারা গেয়েছে, তাদের মধ্যে সুরদাসের গলা অনেক বেশী সুরালো। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে লোকসঙ্গীত বেশ জমিয়ে ফেলল। দেখা গেল, প্রবীণ বিচারকেরাও আপন মনে খুব মাথা দোলাচ্ছেন।

হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত শুরু হল দারুণ বিপর্যয়। এক তাল গোবর এসে গায়কের গায়ে পড়ল। তারপর ক্রমাগত ইট-পাটকেল বৃষ্টি হতে লাগল। একজন প্রবীণ বিচারক আহত হলেন। চারদিকে হৈ-হল্লা বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো দল হয়ে হাতাহাতি মারামারি আরম্ভ হল।

একেবারে যেন দক্ষযক্ষ ব্যাপার। নিরীহ শ্রোতারা অকারণে আহত হয়ে পড়ল। মহিলা ও শিশুদের মধ্যে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল।

সেই যে দুটো দল পৃথক হয়ে মারামারি শুরু করল অতি সহজেই বোঝা যায় যে তারা চিত্রক আর সুরদাসের সমর্থক দল।

চিত্রকের দল যেন আগে থেকে ষড়যন্ত্র করে প্রস্তুত হয়েই ছিল। নইলে যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সুশৃঙ্খল ভাবে চলছিল এবং গত কয়েকদিন ধরেই দর্শক ও শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করছিল, তার ভেতর থেকে কয়েকজন লোক হঠাৎ মারমুখী হয়ে উঠবে কেন!

তবে এই মারামারি আর রেষারেষির ভেতর দেখা গেল, চিত্রকের দল প্রথমে আক্রমণ করে অনুষ্ঠানটি পণ্ড করতে চেয়েছিল বটে, তবে অধিকাংশ শ্রোতার প্রবল প্রতিরোধে তারা কেবলি হটে যেতে লাগল !

যারা গোবর, কাদা ইঁট ছুড়েছিল তারাই ষড়যন্ত্রকারী। কিন্তু সংখ্যায় তারা কম ছিল।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে সাধারণ শ্রোতারা যখন ঐ দুষ্কৃতকারীদের প্রবলবেগে আক্রমন করল তখন তারাই মার খেলো সব চাইতে বেশী, আর পিছু হটে যেতে বাধ্য হল।

ওখানে যারা সেদিন উপস্থিত ছিল, তারা সহজ মন নিয়ে গান শুনতেই এসেছিল। তাদের অন্তরে কোন পাপ ছিল না। কিন্তু চিত্রকের দল প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে করেই হোক সুরদাসকে গাইতে দেওয়া হবে না। কারণ সুরদাস গাইলে সে ছোটদের দলে পুরস্কার পাইবে। তাই সুরদাসের পুরস্কার পাওয়াটা ছলে-বলে-কৌশলে বন্ধ করতে হবে।

ইতি মধ্যে মারামারী উৎসব-প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে অন্য দিকে চলে গেছে। পলায়ন দুষ্কৃতকারীদের বেশ উত্তম-মধ্যম শিক্ষা লাভ হয়েছে। অনেকের মাথা ফেটে গেছে, হাত জখম হয়েছে, কিংবা পা ভেঙে গেছে।

সাধারণ শ্রোতার দল তখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে ওদের একেবারে কুকুরের মতো তাড়া করেছে। যাদের ধাওয়া করেছে, তারা আবার গিয়ে আশ্রয় নিল চিত্রকদের বাড়ি। এইভাবে সেই গুণ্ডার দল নিজেরাই সকলের কাছে চিহ্নিত করে দিল, আসলে কোন্ দল দোষী।

এই ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের বহু টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়ে গেল।

নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত এবং প্রবীণ বিচারকরাও দৈহিক পীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভ করেন নি।

এই নিয়ে গ্রামস্থ লোক এবং পরিচালক সমিতির যেন মাথা কাটা গেল। তাঁরা না পারেন কিছু কইতে আর না পারেন এই অন্যায়টা সইতে !

কথা ছিল, সবগুলি প্রতিযোগিতা সমাধা হয়ে গেল একটা

বিশেষ দিনে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। কিন্তু এই বিশৃঙ্খল অবস্থা ও রেষারেষি আর মারামারির ফলে সবকিছু পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল।

ফলে সার্থক প্রতিযোগীদের আর পুরস্কার দেওয়াই হল না। বিজয়া দশমীর পরে শূন্য পূজামণ্ডপের যে দশা হয়, সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ধ্বংপ্রাপ্ত বিরাট প্যাণ্ডেলের সেই অবস্থা হল। তাকে নতুন করে সাজাবার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে ?

ফলে, আসল উদ্দেশ্য থেকে গ্রামবাসীদের মন অন্য দিকে ধাওয়া করল। প্রতিশোধের তুষের আগুন সবাইকার অন্তরে তখন থেকে ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল।

সুরদাসের দলের লোক সংখ্যায় বেশী। সুরদাস অতি গরিবের ঘরের ছেলে। জীবন-যুদ্ধে অতি কষ্টে বেঁচে আছে। কিন্তু সে যখন আপন মনে গান শোনায়, সবাই সে গান শুনে পুলকিত হয়ে ওঠে। তাই ক্ষেতে কাজ করে যে চাষা, কুয়ো কাটে যে শ্রমিক, ঘর তৈরী করে যে ঘরামি, নৌকা চালায় যে মাঝি, হাটে সওদা করে যে সাধারণ গেরস্থ সবাই মনে করে সুরদাস আমাদের লোক। সে আমাদের দুঃখকষ্টের মধ্যে অন্তরের গান শোনায়। তাকে অপমান করা মানে আমাদের সকলের অপমান।

এই কথা সবাইকার মনে যেন বীণার তারে বাজতে লাগল। ওই চিত্রকদের বাড়ির ওপর সবাইকার একটা জাতক্রোধ জাগল।

এর মধ্যে একদিন চিত্রকদের বাড়ি থেকে লোক এসে কুয়ো কাটে যে কুমোরদের লোক, তাদের সন্ধান করতে লাগল।

চিত্রকদের কুয়োর জল শুকিয়ে গেছে। তাই নতুন করে মাটি না না তুললে আর জল পাওয়া যাচ্ছে না।

কুমোরের দল মুখে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু কেউ ওদের কুয়ো কাটতে গেল না।

যারা ডাকতে এসেছিল, তারা বুঝলে ওরা একজোট হয়েছে। মুখে প্রতিবাদ করবে না, কিন্তু তাদের কাজ করতেও কেউ এগিয়ে যাবে না।

কুয়োর জল শুকিয়ে গেছে ? কিন্তু ও বাড়ির মনটাও যে একেবার শুকনো।

এমন সুন্দর গানের আসর যারা কাদা ছুড়ে, ইঁট মেরে পণ্ড করতে পারে তারা ত পাষাণ।

শীতল জল কে তাদের সরবরাহ করবে ? তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরুক ওরা। ও বাড়িতে কেউ কুয়ো খুড়তে যাবে না।

হাটে যারা মাছ বিক্রি করে, তারাও একজোট হয়েছে।

সেই জেলের দল—সুরদাসকে সবাই ভালোবাসে। ডেকে ডেকে ডিঙিতে নিয়ে যায়। কত ভাটিয়ালী গান শোনে। সেই সহজ মানুষটির গান যারা শুনতে দিল না। কাদা আর গোবর ছুঁড়ে এমন জমজমাট আসর যারা ভেঙে দিল তাদের মুখের দিকে আর কে তাকাবে ?

চিত্রকের বাড়ির দারোয়ান হাটে গিয়েছিল মাছ কিনতে। কিন্তু জেলের দল সব এককাট্টা হয়েছে। যার কাছেই যাচ্ছে সবাই মুখ মুছে জবাব দিচ্ছে, বিক্রির মাছ আর নেই। সব বিক্রি হয়ে গেছে।

দারোয়ান অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সব বিক্রি ?

জেলেরা কপালে ঘাম মুছে বলে, সব ঝুড়ি বিক্রি। তখন মরিয়া হয়ে দাড়োয়ানটা একটা জেলের কাছ থেকে মাছ কেড়ে নিতে গেল।

কিন্তু জেলের দল কোমর বেঁধে একজোট হয়ে দাঁড়ালো। গান যে ভালোবাসেনা সে আবার মাছ খাবে কি ? খ্যাসারির ডাল কিনে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও।

অপমানিত হয়ে মাথা হেঁট করে দারোয়ান ঘরে ফিরে গেল। হাটের মাছ ওদের কাছে বন্ধ হয়ে গেল।

*

* *

খালের ধারে এক নিরিবিলি গাছ-গাছালিতে ঢাকা অঞ্চল। সেইখানে জুটেছে সুরদাসের বন্ধুবান্ধব আর গাঁয়ের মাতব্বরের দল।

সুরদাসও অবশ্য সেখানে উপস্থিত আছে। কিন্তু মাথা নীচু করে রয়েছে, কোন কথা বলছে না।

আর যারা উপস্থিত, তারা সকলেই বিশেষ উত্তেজিত। বিষ্টু কামার হাত উঁচু করে কইলে, এ অপমান ত একা সুরদাসের নয়। গোটা গাঁয়ের অপমান করেছে শয়তানরা।

গুপী কুমোর বাঁ হাতের চেটোর ওপর ডান হাত দিয়ে একটা থাবড়া মেরে কইলে, একেবারে সভার মাঝে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান। সেখানে সাত গাঁয়ের মানুষ হাজির ছিল। সবাইকার সামনে আমাদের কোন ইজ্জতটা রইল?

ঘাটের মাঝি সনাতন দাস সুরদাসের গানের একজন বিশেষ ভক্ত। সে এত চটেছে যে ভালো করে কথা কইতে পারছে না। মাথা নেড়ে বললে, আহা-হা! আসরের মধ্যে এমন জমাটি গান আর গোবর ছুড়ে থামিয়ে দিলে? ওরা কি মানুষ? ওদের সবাইকার নাকে ঝামা ঘষে দিতে হয়।

রদাস শুধু মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে চাইলে, ধীরে ধীরে বললে, যেতে দাও সনাতন খুড়ো। মিছে চটে লাভ কি?

সনাতন দাস তেড়েমেড়ে উঠে হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে কইলে তুই চুপ করে থাক। তোর একার কথা নয় এটা। ওই শয়তানের দল সারা গাঁয়ের মুখে চুনকালি মেখে দিয়েছে। এ হচ্ছে দশজনের মান-অপমানের কথা।

তখন সবাই মাথা নেড়ে কইলে, ঠিক, ঠিক! এর একটা বিহিত করতেই হবে।

সনাতন কোমরে হাত দিয়ে কইলে, আমরা ওদের সঙ্গে মারামারিও করতে যাবো না, দাঙ্গা হাঙ্গামাও বাঁধাতে যাবো না। তবে ওরা ভালো করে বুঝুক, মানুষ একজোট হলে কি করতে পারে।

গুপী কুমোর কইলে, ওদের বাড়িতে আমরা আর কলসীকুঁজো দেবো না। কুয়োর জল কমে গেলে কোমরে দড়ি বেঁধে নীচে নেমে আর মাটি তুলে দেবো না।

বিশু গোয়াল মাথা দুলিয়ে বললে, হক্ কথা। আমরাও পালাপার্বণে ওদের বাড়ি খাসা দই আর ঘি সরবরাহ করবো না।

ঘাটের জেলেরা উত্তেজিত হয়ে কইলে, মাছ ত আমরা বন্ধ করেই দিয়েছি। এখন লোক পাঠিয়ে শহর থেকে পচা মাছ নিয়ে আসুক।

এই সংবাদে উপস্থিত সবাই উল্লাসিত হয়ে উঠল। একজন টিপ্পনী কাটলে, ঠিক কথা। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। কত মাসে বছর হয় এখন বিচ্ছুর দল বুঝে নিক।

একটা বিদ্রূপ আর হাসির ঢেউ বয়ে গেল সবাইকার মাথার ওপর দিয়ে।

যাদের নিয়ে এত উত্তেজনা সেই চিত্রকদের বাড়িতেও ফুসফুস গুজ গুজ চলছে অবিরাম।

যারা সকল নাটের গুরু তারা হচ্ছে বালখিল্যের দল। একটা গোলমাল পাকিয়ে তোলবার ব্যাপারে ওদের উৎসাহের অন্ত নেই। ওরাই অতি গোপনে কাউকে না জানিয়ে ষড়যন্ত্র করছে, তারপর গোবর, কাদা, ইঁটের টুকরো সংগ্রহ করেছে।

আসল সময় ঠিক কখন শুরু হবে, সেটা স্থির করছে চিত্রক নিজে। আগে থেকেই বলে রেখেছে আক্রমণকারীদের যে, তার বাঁশী বাজলেই মঞ্চের দিকে গোবর, কাদা আর ইঁট-পাটকেল ছুড়তেশুরু করতে হবে।

সেই ভাবেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

কিন্তু শ্রোতার দল যে দলবদ্ধভাবে এমন মারমুখী হয়ে উঠবে তা কিন্তু ওরা আদপেই বুঝতে পারে নি।

ফলে ওরা আগে যেমন নষ্টামি শুরু করেছে, তেমনি মার খেয়েছেও বেশী।

অনুষ্ঠানটা অবশ্য পণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু শয়তানির সাজা ওরা হাতে হাতে পেয়েছে।

চিত্রকের দল একটা কথাই শুধু ভেবে রেখেছিল যে গানের আসরটা পণ্ড করতে হবে।

তার মানে সুরদাসকে কিছুতেই গাইতে দেয়া হবে না।

ষড়যন্ত্রকারীদের শয়তানী অবশ্য সফল হয়েছিল, কিন্তু ঢিলটি ছুড়লে

সঙ্গে সঙ্গে পাট্‌কেলটি খেতে হবে—এ হিসেবটি করতে ওরা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। তাই নষ্টামির পর অনেকদের পিঠই ফুলে উঠেছিল। বহু বিচ্ছুর ঠ্যাং খোঁড়া হয়েছিল। অনেকের চোখের কোণ ফুলে উঠেছিল।

এর পরের ঘটনা হচ্ছে—হাটে জেলেদের কাছে মাছ কিনতে গিয়ে মুখ চুন করে ফিরে আসা। দারোয়ান ফিরে এসে নালিশ জানিয়েছিল।

তখনই খবরটা বাড়ির বুড়ো কর্তার কাছে পৌঁছে গেল। তখন তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বাড়ির বিচ্ছুদের ডেকে পাঠালেন। এদের সঙ্গে পাড়ার অনেক ফিচেল ছেলেও জড়িয়ে ছিল। একে একে তাদেরও ডাকা হল। কারণ সবাইকার আড্ডাখানা হচ্ছে—এই বাড়ির একটি এঁদো পুরোনো এক কোণের নিরিবিলি ঘর।

জেলেরা যেমন ঝাঁকি জাল দিয়ে পুকুরের সব মাছ ধরে ফেলে, তেমনি দারোয়ান গিয়ে সবকটি বিচ্ছুকে ধরে কর্তার কাছে এনে হাজির করেছে। সেইখানে বসেছে আসল বিচারসভা।

বাড়ির দাদু মানে বুড়ো কর্তা সহজে চটেন না। কিন্তু তিনি কোন মতেই অন্যায় বরদাস্ত করেন না।

তিনি একটি আরাম কেদারায় বসে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছিলেন। মাথা তুলে বালখিল্যদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তার মধ্যে আমাদেরও সম্মতি নেয়া হয়েছিল। আমরা খুশী মনেই এই কাজে সম্মতি দিয়েছিলাম। তোমরা হঠাৎ মাঝখান থেকে গিয়ে বাধার সৃষ্টি করলে কেন?

একজন উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, দাদু, ওরাই ত চিত্রকের জন্মদিন পণ্ড করেছিল। তার একটা প্রতিশোধ নেওয়া ত প্রয়োজন?

দাদু উত্তর দিলেন, মোটেই সে-কথা সত্যি নয়। চিত্রক ক্লাসের ছেলেদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে ইচ্ছে করে একজনকে অপমান করবার জন্য বাদ দিয়েছিল। সে কাজটা আদৌ ভালো হয় নি। সবাইকে বাদ দিলে অবশ্য বলার কিন্তু ছিল না।

এইবার চিত্রক উত্তর দিলে, ওই সুরদাসকে আমি আদৌ সহ্য করতে পারি না। একেবারে ভিখিরীর মতো চেহারা। মুখটা এত বিচ্ছিরি যে তাকানো যায় না। এই ভিখিরীটা আমার বাড়িতে আসুক, এটা আমি আদপেই চাই যে।

দাদু মাথা নেড়ে কইলেন, কিন্তু আমি শুনেছি ছেলেটি ভারি সুন্দর গান গায়। সারা গাঁয়ের মানুষ ওকে ভালোবাসে। যাকে সবাই ভালোবাসে তার গুণের জন্যে, সে গরিব হতে পারে কিন্তু খারাপ লোক মোটেই নয়। তারপর সে যদি গান গেয়ে পুরস্কার পায়, তাতে তোমার কি আপত্তি? তুমি কেন ষড়যন্ত্র করে অনুষ্ঠান পণ্ড করতে যাও? ছেলেটি পুরস্কার পেলে ত গ্রামেরই গৌরব! তুমি যে অন্যায় কাজ করেছ, সেজন্য তোমার সুরদাসের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

এইবার কিন্তু চিত্রক চটে উঠল।

মোষের মতো ফোঁস ফোঁস করে বললে ওই ভিখিরীটার কাছে আমি গিয়ে ক্ষমা চাইব? প্রাণ গেলেও না। বরং দেখো, যাতে ও আর এই গ্রামে থাকতে না পারে।

দাদু গম্ভীর কণ্ঠে কইলেন; সুরদাসের দোষ, সে এমন গান গায় যে সবাই তাকে ভালোবাসে। মানুষের গুণই আসল, তার চেহারা নয়। আর সুরদাসকে আমি দেখে নি। শুনেছি সে গরিব, কিন্তু সে বিনয়ী আর ভদ্র। দিনরাত তার জ্যাঠামশায়ের সংসারে প্রাণপাত পরিশ্রম করে। এতে তার গুণই প্রকাশ পাচ্ছে। এমন গুণী সহপাঠীকে তুমি সহ্য করতে পারে না, এটা খুবই বেদনার কথা। তোমার উচিত তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া। তা হলেই সব মনোমালিন্য মিটে যাবে।

এইবার চিত্রক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। মাথা উঁচু করে কইলে, ক্ষমা চাইব আমি ওই ভিখিরীটার কাছে? আমার প্রাণ গেলেও আমি তা পারবো না। যে করেই হোক, এই গ্রামথেকে'আমি ওকে তাড়াবো।

এইবার বাড়ির কর্তা চটে-মটে হাতের গুড়গুড়ির নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

চোখ গরম করে কইলেন, দেখ, আমি বুড়ো হয়েছি একথা সত্যি।

কেউ আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে কথা কইতে পারে না। আমি অথর্ব বটে, কিন্তু আমার চাবুকটা এখনো চক্‌চকে আছে।

এই কথা শুনে চিত্রক দল ছাড়া শুয়োরের মতো গোঁ-গোঁ শব্দ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই সঙ্গে তার চ্যালা-চমুণ্ডাব দলও সুট্ সুট্ করে এধার-ওধার পালিয়ে গেল।

দাদু-পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তিনি গড়গড়ীর নলটা হাতে তুলে নিতেও ভুলে গেলেন। খাস খানসামা ওটা তুলে দিতে এসেছিল।

তিনি শুধু মাথা নীচু করে কইলেন থাক।

এই ঘটনার দিন পনেরো পরের কথা।

বুড়ো কর্তার নাতির ঘরের পুতির শুভ অন্নপ্রাশন। বুড়ো কর্তা কইলেন, আর ক'দিনই বা আছি, এই আমার শেষ কাজ। ভেবেছি, একটু ধুমধাম করবো। আত্মীয়স্বজন সবাইকে আনাবো। মরবার আগে সকলকে একবার চোখের দেখা দেখে যেতে চাই।

নায়েব-গোমস্তারা শুনে তৎপর হয়ে উঠল। গোমস্তাকে পাঠানো হল নানা জারগায়—দৈ, মিষ্টি, ক্ষীর, ঘি, তেল প্রভৃতির বায়না দেবার জন্য। আগে থেকে সব ব্যবস্থা করতে হবে।

গোয়ালা মাথা নেড়ে জবাব দিলে, গোমস্তা মশাই, আমি দৈ বসাতে পারবো না, আঙুলহারা হয়েছে। আপনি ভিন্ গাঁয়ে দেখুন।

ঘি যে তৈরি করে, সে বললে, আপনারা আগে ত জানান নি, আমার সব ঘি শহরে বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানে ত বেশী ঘি কেউ নেয় না। আপনি বরং শহরেই যান।

রসগোল্লা আর সন্দেশের যে কারিগর সে মাথা চুলকে বলল, গোমস্তা মশাই, এ যাত্রায় আমি ত বায়না নিতে পারছি না। আমার মেয়ের বড্ড বাড়াবাড়ি অসুখ। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে জরুরী চিঠি নিয়ে লোক এসেছে। কাল ভোরেই আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি। গ্রাম

দেশে বেশী মিষ্টি ত একসঙ্গে তৈরি করি না। যা ঘরে ছিল হাটে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন নিরূপায়!

গোমস্তা যার কাছেই এগিয়ে যায়, সে একটা অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটায়। কেউ আর বায়না নিতে চায় না।

অবশেষে কলুর বাড়ি গিয়ে হাজির হল গোমস্তা। বললে, ওহে কলুর পো, কর্তার বাড়ি যজ্ঞি ব্যাপার। অনেকটা খাঁটি সরষের তেল দিতে হবে। বায়না নিয়ে কাজ শুরু করে দাও।

কলু মাথা নীচু করে প্রণাম জানিয়ে কইলে, দেখুন গোমস্তাবাবু, আমার শালা এসে দুটো বলদই নিয়ে গেছে। ওদের নাকি খুব দরকার। তাই আমি এখন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছি। বায়না নেবার উপায় নেই কর্তা।

শেষকালে জেলে পাড়ার গিয়ে হাজির হল গোমস্তা। ওহে জেলে ভাই শুনছ, অনেক মাছ দরকার এক মাস ধরে। তোমরা দলবল নিয়ে মাছ ধরবে, কর্তার নিজেরও অনেক পুকুর আছে। বায়না নিয়ে কাজে লাগো।

জেলেরা একজোট হয়ে উত্তর দিলে, হুজুর আমাদের জাল বেবাক ছিঁড়ে গেছে। আমরা ত এ-কাজের দায়িত্ব নিতে পারবো না! আমাদের মাফ করতে হবে।

*

* *

মুখ চুন করে গোমস্তা ফিরে এলো কর্তার কাছে। সবাই যে পাশ কাটাচ্ছে, কেউ বায়না নিতে রাজি হচ্ছে না, সে কথা সবিনয়ে নিবেদন করল গোমস্তা। তারপর মাথা চুলকে বললে, যদি অভয় দেন কর্তা ত একটা কথা কই।

গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছেন কর্তা। মুখখানা তেলো হাঁড়ির মতো গম্ভীর। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলেন, কি বলবে বলে ফেল। কোনো রকম ভূমিকা করবার দরকার নেই।

গোমস্তা মাটির দিকে চোখ রেখে কইলে, ওরা সবাই একজোট হয়ে এই চৌধুরী বাড়ি বয়কট করেছে। কেউ আর বায়না নিতেও মাথা কাত করে না। ওই চিত্রকবাবুর সেই ব্যাপারটার জন্যেই বোধ করি।

বুড়ো কর্তার মুখ আরো ভারী হয়ে উঠল। গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানার শব্দ আরো দ্রুত হল। মুখে শুধু একটা বোমা ছুঁড়লেন, হুঁ। তারপর আরো খানিকক্ষণ ওইভাবেই চুপচাপ রইলেন। হঠাৎ বলে বসলেন, চিত্রককে ডাকো।

গোমস্তা এতক্ষণ বলির পাঁঠার মতো দাঁড়িয়ে থেকে যেন পায়ে জোর পাচ্ছিল না। এইবার একটা কাজ মিলতে একেবারে দরজার বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

চিত্রককে এখানে পৌঁছে দেয়া এমন আর কী শক্ত কাজ! তারপর আরো একটা জরুরী কাজ হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। বাইরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কর্তার ঘরে আড়ি পাততে হবে। কর্তার মন মেজাজটা এই ব্যাপারে কি রকম হল, সব বুঝতে হবে ত।

একটু বাদেই চিত্রক বুড়ো কর্তার বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হল।

কর্তা তখন মুখভার করে গুড়ুক গুড়ুক করে গড়গড়ার নল টানছেন। চিত্রককে দেখে কপালে অনেকগুলো রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে গম্ভীর গলার কথা শোনা গেল।

হুঁ, এই যে এসেছো। তোমার কুকীর্তিতে এখন চৌধুরী বাড়িতে কেউ তেল, ঘি, মাছ, দই, মিষ্টি কিচ্ছু দিতে রাজি হচ্ছে না। এখন বুঝতে পারছ ওই পথের ভিখিরী সুরদাসকে সবাই কেমন ভালোবাসে? তোমার ওপর দেখছি সবাই চটা। ঢিলটি ছুঁড়লে যে পাটকেলটি খেতে হবে, একথা বুঝি তখন মনে হয় নি? এখন তোমরা রইলে একগাঁয়ে এক ঘরে হয়ে। কেউ আর চৌধুরী বাড়িতে জিনিস দেবে না। এখন যাও, ওই চ্যালাচামুণ্ডাদের নিয়ে শহরে গিয়ে সবকিছু সওদা করে এসো।

একটু থেমে আবার বললেন, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে! চৌধুরী বাড়ির উঁচু মাথা তোমরা এমন করে নীচু করালে।

বাইরে গোমস্তা আড়ি পেতে আছে, আর ভেতরে চিত্রক বোকার মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে।

সে এক অপরূপ দৃশ্য

অবশেষে চিত্রকই সেই অসহ্য নীরবতা খানখান করে ভেঙে ফেলল। বললে, আপনি কিছু ভাববেন না। যেমন কুকুর তেমনি মুগুরও ত আছে। আমরা সেই দাওয়াইয়েরই ব্যবস্থা করবো।

চিত্রক দ্রুপদে কর্তার বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ বাদে বেগুন-বেচা মুখ করে আবার গোমস্তার প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে কর্তা হুকুম দিলেন সব ব্যাটাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে আনতে পারো না?

গোমস্তা মাথা নীচু করে কইলে, সে-কথা কি আমি এতক্ষণ ভাবিনি কর্তা? তারপর ফিসফিস করে কইলে, ওরা যে কেউ আমাদের ভিটে বাড়ির প্রজা নয়। বিপদ যে হয়েছে ওইখানেই। নইলে এতক্ষণ ব্যাটাদের গলায় গামছা দিয়ে হুজুরের পায়ের তলায় এনে ফেলতাম না।

কর্তার মুখে আবার গড়গড়ার নল বেসুরো শব্দ করতে লাগল। তিনি কম কথায় কইলেন, হুঁ! সে-কথা সত্যি। আজকাল আবার আইন-টাইনগুলো বড় কড়া করে গাঁথা হয়েছে।

গোমস্তা হাত জোড় করি উত্তর দিলে, আচ্ছা, আমি নায়েবমশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখছি, কি করা যায়।

বাঘের মুখের সামনে থেকে যত তাড়াতাড়ি পালানো যায় ততই মঙ্গল। "যে পালাবে সেই বাঁচবে"—এই নীতি অনুসরণ করে কর্তাকে একটা আভূমি প্রণাম জানিয়ে গোমস্তা দ্রুতবেগে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো। মনে মনে বললে, বাব্বা! একটা ফাঁড়া কোনো রকমে কাটল।

মনে যার গনগনে আগুন জ্বলছে, সে কি চুপচাপ বসে থাকতে পারে? তার কেবলি মনে হয় সারাটা ছুনিয়া পুড়িয়ে খাক করে দি। চিত্রকের এখন সেই অবস্থা।

—ওই বিচ্ছিরি ভিক্ষুকের ছেলে সুরদাস, তার গলার গানে এত মোহিনী শক্তি যে, গোটা গ্রামের মানুষগুলোকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে ?

কেউ আর চৌধুরী বাড়ি সওদা নিয়ে আসবে না ? কিছুদিন আগেও এই চৌধুরী বাড়িতে তেল, ঘি, মিষ্টি, দৈ, ক্ষীর বিক্রি করবার জন্য কত সাধাসাধি চলত। লাইন দিয়ে এসে খোসামোদ করত। আজ সবাই একসঙ্গে নিমকহারাম হয়েছে ? ওদের সবাইকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আর সেই সঙ্গে সুরদাসটার গুমোর ভাঙতে হবে। একটা গোপন পরামর্শসভা বসেছে চৌধুরী বাড়ির আঁধারি ঘরে।

চিত্রক শুধু মাথার চুল ছিঁড়ছে আর বলছে, আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না, আমাদের সবাইকার চিরচেনা গাঁয়ে এই ঘটনা সম্ভবপর হল কি করে ? ওই ত ভূতের মত চেহারা, সাত জন্মে মাথায় তেল পড়ে না। খড়ি ওঠা দাগ ভর্তি ক্যাবলা ক্যাবলা মুখ। একবার ওর দিকে তাকালেই অন্নপ্রাশনের ভাত গলা দিয়ে উঠে আসে। সে আবার এমন গান গায় যে সাতটা গাঁয়ের মানুষ একেবারে মোহিত হয়ে যায়। ওর চাইতে কাকের ডাকও দিব্যি মিষ্টি।

ভোম্বল ফোড়ন কেটে বললে, তুমি রেগে আছ তাই ! নইলে চেহারা ওর যতই উজবুকের মতো হোক, গানের গলা সুরদাসের সত্যি মিষ্টি। ও যখন সন্ধ্যেবেলা নদীর ধারে নৌকার ছাদে বসে ভাটিয়ালী সুরে গান ধরে, তখন ইস্কুলের ছেলেদের দল, হাটের ব্যাপারী, নৌকার মাঝি, কামার-কুমোর আর গঞ্জের মানুষগুলো সেখানে জমায়েত হয়ে কেমন করে সেই মন মজানো গান শোনে, দেখো নি ? সে-কথা ত কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না।

চিত্রক মাথা নেড়ে উত্তর দেয়, বয়ে গেছে আমার দেখতে আর শুনতে। যত সব আ-দেখলার দল। চাবুক মেরে সবাইকে শায়েস্তা করতে হয়।

আর এক বন্ধু বিদ্যুৎ নতুন এসেছে এ বাড়িতে। সে চোখ নাচিয়ে

ফোড়ন কাটলে, দেখ, তুমি যদি দেশের রাজা হতে, তাহলে শুধু চাবুক কেন, সবাইকার হাতে মাথা কাটতে।

গণেশ কইলে থাকগে, কথায় কথা বাড়ে। এখন ওদের কব্জায় আনতে কি করতে হবে, সেই ব্যাপারেই শালাপরামর্শ করা যাক।

একজন মন্তব্য করলে, রাতের অন্ধকারে কলুর ঘানি, গোয়ালার হাঁড়ি, ঘি-ওয়ালার বৈয়ম আর রসগোল্লার কড়াই বেমালুম সরিয়ে ফেলা যাক। তা হলেই ব্যাটারা ঠিক শায়েস্তা হবে।

কৈবল্য কইলে, নানা তাতে শত্রুতা আরো বেড়ে যাবে। তার চাইতে গভীর রাত্রে একজন গিয়ে সুরদাসের কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়ে দাও। হয় বাছাধন ঘুমের মধ্যে পুড়ে মরবে, আর না হয় পড়ের দিন গ্রাম ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না।

আর একজন হাতে তালি দিয়ে কইলে আহা! কি বুদ্ধি তোর! বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি! কুঁড়েঘর কি সুরদাসের পৈতৃক সম্পত্তি? সবই ত ওর জ্যাঠামশায়ের জিনিস। মাঝখান আগুন লেগে যদি গোয়ালের দুধালো গাইগুলো মরে যায়, তাহলে গো-হত্যার পাতক হতে হবে। সারা গাঁয়ের মানুষ ক্ষেপে যাবে। সবাই চালের ভাত খায়। কারো আর বুঝতে বাকী থাকবে না যে, এই অপকর্ম কার পরামর্শে হয়েছে!

চিত্রক যেন এই দরকারী কথাগুলো শুনে একবার থমকে দাঁড়ালো।

—না-না, ভালো করে না ভেবেচিন্তে আগুনে হাত দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ফলে দুই দলই রেগে আগুন হয়ে উঠবে। এদিকে গ্রামের বজ্জাতের দল, অপর দিকে চৌধুরী বাড়ির স্বয়ং বুড়ো কর্তা। তখন আমার অবস্থা হবে—রামে মারলেও মারবো' আবার রাবণে মারলেও মারবো! আচ্ছা কি করা যায় বল ত? সেই গোবর আর কাদা ছোঁড়ার পর থেকে এমন সব গোলমেলে কাণ্ড শুরু হল যে, খেতে পারি নে, শুতে পারি নে, ছবি আঁকা মাথায় গিয়ে উঠল, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠি।

আর একজন চোখ কপালে তুলে কইলে, আমাদের গেঁয়ো বুদ্ধিতে

কিছু হবে না। আইন বাঁচিয়ে কাজ করতে এগিয়ে যেতে হবে। একজন পাকা মাথা উকিলের একান্ত আবশ্যক !

এক প্রবীণ উকিলকে ধরা হল বুদ্ধি আর পরামর্শ যোগাবার জন্য। প্রবীণ উকিলের পাকা মাথা।

তিনি আগাগোড়া সব শুনে বললেন, দেখ বাপধনেরা, তোমরা সাক্ষী রেখে কাদা আর গোবর ছুঁড়ে অত্যন্ত কাঁচা কাজ করেছ। গোটা গাঁয়ের মানুষ তোমাদের অপকর্মের সাক্ষী। তাই ত তোমাদের বিরুদ্ধে সবাই জোট বাঁধতে পারল। কিলও খেলে' আবার বদনামের ভাগী হলে। এভাবে কি আর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। এমনভাবে হাত সাফাই করবে যে, কাক-পক্ষীতে কেউ টের পাবে না। ম্যাজিক-ওয়ালা ম্যাজিক দেখায়, বড় বড় চোখ মেলে দেখছ ত ? তোমাদের সবাইকার সামনে দিয়ে পুকুর চুরি হয়ে যায় কিন্তু কেউ জানতে পারে না, বুঝতে পারে না।

যাদুবিদ্যা মানে চোখের ধাঁধা। তোমারও যদি কোনো কিছু করতে চাও, তাহলে চোখের ধাঁধার সৃষ্টি করাত হবে। কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না, কোনো সাক্ষী থাকবে না অথচ চমৎকার হাতসাফাই হয়ে যাবে। বলি বাপধনেরা, বুঝতে পারলে কিছু ?

চিত্রক মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলে, কিছুটা বুঝতে পেরেছি।

এর পর থেকে সুরদাসের সংসারে নানা রকম জাদুর খেলা শুরু হয়ে গেল। দুটো ছাগল চড়তে গিয়ে ফিয়ে এলো না; গোয়াল ঘর থেকে দুধালো গাই উধাও, সুর দাস হাটে যাবে লাউ, কুমড়ো বিক্রি করতে, কিন্তু রওনা হবার সময় ঝাঁকিটা খুঁজে পাওয়া গেল না। অঙ্কের খাতাটা কুলুঙ্গীতে ছিল কিন্তু তার পাখা গজালো কি করে ? কলাগাছ থেকে কাঁদি উধাও, পুকুরের ধারে সুপুরি গাছগুলো থেকে থোকা থোকা সুপুরি রাতের আঁধারে কোথায় কে চক্ষুদান করলে—এই সব অপকর্মের জন্যে সুরদাস জ্যাঠামশায়ের কাছে কেবলি বকুনি খেতে লাগল। উৎপীড়নের মাত্রা উদারা-মুদারা-তারায় গিয়ে পৌঁছুলো।

কিন্তু ইন্দ্রজাল ইন্দ্রজালই রয়ে গেল।

*

* *

ওই যে কথায় বলে না—ছুতোরে ঠুক্‌ঠাক্‌, কামারের এক ঘা, এ ব্যাপারেও অনেকটা তাই দাঁড়ালো।

এ আর কলাটা-মূলোটা সরানো নয়।

চৌধুরী বাড়ির লোকেরা একদিন সকালে উঠে দেখল—তাদের বাগানে যত দামী ফুলগাছ ছিল, সব একেবারে উধাও।

কে নিল, কে নিল?

কিন্তু তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

গাছের শেকড়সুদ্ধ একেবারে লোটপাট!

কোন্‌ ময়দানবের হাতের ইশারায় জাদুর এই খেলা? আবার একদিন দেখা গেল।

চৌধূরী বাড়িতে চিত্রকের যত ছবি আঁকা ছিল—

সব রাতারাতি পাখা মেলে পালিয়ে গেছে!

চিত্রকের বন্ধুরা রসকত করে কইলে, জাদুর খেলায় ওরা কিন্তু বেশী কেরামতি দেখিয়েছে। একেই বলে সত্যি কারের ইন্দ্রজাল।

এদিকে নাতির ঘরের পুতির অন্নপ্রাসনের দিন এগিয়ে এলো। আশেপাশের অঞ্চল থেকে খাদ্যসম্ভার সংগ্রহ করা হল।

চৌধুরী বাড়ির নিজেদেরই অনেক পুকুর। বাইরে থেকে জেলে এনে জাল দিয়ে মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হল।

চৌধুরী বাড়ির বুড়ো কর্তা নিমন্ত্রেণে এতটুকু কৃপণতা করেন নি। তিনি বামুন পাঠিয়ে গ্রামস্থ লোককে নিমন্ত্রণ করেছেন।

আবালবৃদ্ধবণিতা এসে পাত পেতে খেয়ে যাবেন—এই ব্যবস্থাই বুড়ো কর্তা করেছেন।

তিনি বাব বার সবাইকে শুনিয়ে বলছেন, এই আমার জীবনের শেষ কাজ। তারপর আমি ড্যাং-ড্যাং করে নারদের ঢেঁকিতে চড়ে চলে যাবো।

সবাই কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে—নারদের ঢেঁকি কেন ? বৈকুণ্ঠের রথ নয় কেন ?

বুড়ো কর্তা সবাইকে হেসে হেসে জবাব দেন, বৈকুণ্ঠের আসবে এত বেশী পুণ্যি ত করি নি। আমার পক্ষে নারদের ঢেঁকিই ভালো। দিব্যি দোল খেতে খেতে মেঘের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া যাবে। নীচে তখন কি হচ্ছে তা-ও চোখে পড়বে। গোটা পৃথিবীতে, এই সংসারকে, তার সব কিছু ভালোমন্দকে একেবারে "গুড্-বাই" করে চলে যাবো। তখন কারো কথা কানে নেবো না। হালকা হাওয়ায় দুলতে দুলতে একেবারে মেঘের ভেতর দিয়ে নারদের ঢেঁকি চালিয়ে দেবো। সে ভারি মজা হবে।

তাই বুড়ো কর্তা একেবারে দিল্‌দরিয়া।

গাঁয়ের কারিগরের মাল দেবে না ? কুচ পরোয়া নেই।

বাইরে থেকে ভাঁড়ে ভাঁড়ে খাদ্যসম্ভার আসছে।

কোনো জিনিসের কম্‌তি না ঘটে !

ঘি-ময়দা থেকে শুরু করে রসগোল্লা-সন্দেশ-দৈ-ক্ষীর-মাছ গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে আসছে।

আত্মীয়স্বজনে ঘর ভরে গেছে।

রমরমা গমগম করছে সারা বাড়ি।

কে কত রসগোল্লা খাবে খাও না।

এ ছাড়া হালুয়া তৈরী করেছেন বাড়ির গিন্নীরা।

সেই সঙ্গে মাসী-পিসির দল নারকেব নাড়ু, নানা জাতের পিঠে-চিড়ে-জিরে-চন্দ্রকাট্-আউলা-বাউলা—কত রকমের নাড়ু-বড়ি-মিষ্টি !

গরম গরম হাত পেতে নাও আর গালে পোরো।

চিত্রক এসে বায়না ধরলে—

বাইরের গেটে তোরণদ্বার সাজাতে হবে।

তাতে থাকবে নানা রকমের পৌরাণিক ছবি আর নকশা।

আজ বুড়ো কর্তা একেবারে কল্পতরু সেজে বসে আছে।

কারো কোনো আবেদন বাতিল করে দিচ্ছেন না।

গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানতে টানতে বুড়ো কর্তা কইলেন, তোরণদ্বার? বেশ তাই তাই হবে। তবে একটি কথা—এই কাজে তোমাদের স্বাবলম্বী হতে হবে। নিজের হাতে তোরণ গড়তে হবে, গেট সাজাতে হবে, নকশা আর ছবি লাগাতে হবে। কারণ জানো ত? ঘরামীরা কেউ একাজে এগিয়ে আসবে না।

চিত্রক মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, একাজে আমরা কেউ পেছপা নই। আমার বন্ধুরা বাঁশ আর বাখারি দিয়ে দিব্যি গেট তৈরি করতে পারবে। তার ওপর নকশ আর ছবির দায়িত্ব নিচ্ছি আমি নিজে। দেখবে, কেমন চমৎকার সাজসজ্জা গড়ে ওঠে। তোমার ওই রসগোল্লা-সন্দেশ ফেলে নিমন্ত্রিতের দল সবাই আমার তোরণদ্বারের তারিফ করবে।

—করলেই ভালো।

তামাক টানতে টানতে সকৌতুকে জবাব দেন বুড়ো কর্তামশাই।

চৌধুরীদের বাগান থেকে রাশি রাশি কলাপাতা আসছে। মাসী-পিসীর দল সেই কলাপাতা বিছিয়ে ক্ষুদে পেটুকদের ডাকছেন খাবার খেতে।

কেউ নোনতার ভক্ত, কেউ মিষ্টির প্রত্যাশী। মাসী-পিসীর দল হাসিমুখে সবাইকে পরিবেশন করেছেন। বাড়ীতে যারা বড়ো আর বুড়ো ছেলে, তারা এক এক ঘরে এক এক রকম আসর বসিয়েছে। সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে বাড়ির একপাল জামাই।

কোনো ঘরে ক্যারাম চলছে, কোনো ঘরে তাস নিয়ে ব্রীজ খেলা জমে উঠেছে। একটু যারা প্রবীণ তাঁদের ভিড় দাবাকে কেন্দ্র করে। মেয়েরা 'বারো ঘুঁটি বাঘ চাল নিয়ে ব্যস্ত। আবার কিশোর-কিশোরী দলের আলাদা আসর। তারা ব্যাগ থেকে গোয়েন্দা কাহিনী বের করছে আর গোগ্রাসে গিলছে।

লুড়ো আর 'স্নেকস্ অ্যাণ্ড ল্যাডার' চলছে ঘরের কোণে কোণে। ঠাকুমা-দিদিমা যদি পায়েস খেতে ডাকে, তাহলে ওরা যেন কানেই শুনতে পায় না। গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠক-পাঠিকারা ত বিশ্বভুবন ভুলে গেছে।

হঠাৎ বাড়ির এক শৌখিন জামাই এক দামী ক্যামেরা নিয়ে হাজির হয়েছে। নানা 'পোজে' তার নানা বেশে ছবি তোলা হচ্ছে। খাটলার ধারে শশাগাছের মাচার পাশে, তেঁতুল তলায়, রজনীগন্ধা আর গোলাপের বাগানে, গোয়াল ঘরে, ঢেঁকশালে, ধানের মরাইয়ের পাশে ছাদের ওপর ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে যত বিচিত্র ছবির মেলা।

দল বেঁধে সে সবাই খাবার খাচ্ছে, তারও ছবি তোলা হচ্ছে বিচিত্র ঢঙে।

দিদিমণির দল শাড়ি পরে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে বসন্ত রাণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এমন কি বাড়ির দাস-দাসীরাও বাদ যাচ্ছে না। কে কোমর বেঁকিয়ে বাটনা বাটছে, কে বসে মাছ কুটছে। কে ঢেঁকিশালে পাড় দিচ্ছে, কে পুকুরের ধারে খাটলায় বসে কাপড় কাচছে, কাউকে কিছু না জানিয়ে জামাইবাবু দিব্যি তুলে নিচ্ছে সব রকমারী ফটো।

এ যেন এক লুকোচুরি খেলা!

চৌধুরী বাড়ির আনন্দ আর উল্লাস যত বেড়ে যেতে লাগল, সবার আড়ালে আড়ালে কালো মেয়ের ছায়া যেন ঘনিয়ে এলো। সেটা আর কারো চোখে হয় ত পড়ল না।

কিন্তু বুড়ো কর্তা যেন এক অদেখা বিপদের ইশারায় মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে উঠতে লাগলেন।

চৌধুরী বাড়িতে চলেছে অষ্টপ্রহর অট্টহাসি আর কলরবের কলকোলাহল।

খাওয়া-দাওয়া। গান-বাজনা। খেলাধূলা ক্ষণে ক্ষণে। ছবির রাজ্যের ছায়াবাজি ; আর চিত্রকের আনন্দ উল্লাস।

অবশেষে এসে পড়ল আনন্দের সেই বিশেষ দিনটি।

নাতির ঘরের পুতির অন্নপ্রাশন।

সকাল থেকে সানাই বাজছে তৈরি নহবতে।

রাত্রে বাজি পোড়ানো হবে, তার ব্যবস্থা হয়েছে। থরে থরে সব খাবার রান্না হচ্ছে।

বামুন ঠাকুরের দল খেটে খেটে একেবারে হিমশিম !

গোটা গ্রাম নিমন্ত্রিত।

এ ছাড়া আরো কত লোক আসবে হিসেবের বাইরে, আত্মীয়স্বজনের আসার এখনো কামাই নেই।

গরুর গাড়িতে করে। পাল্‌কিতে চেপে—আর নদীপথে নৌকো করে।

বুড়ো কর্তা বললেন, এই সামনের বারান্দার একটি আরাম কেদারায় আমায় বসিয়ে দাও।

গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানবো, আর লোকজনের আসা-যাওয়া দেখবো।

সকালবেলা থেকেই যাতে বাল্যভোজ শুরু হয়, তার জন্যে আলাদা আয়োজন করা হয়েছে।

রাশি রাশি কলার পাতা কেটে আনা হয়েছে। মাটির গেলাস আর মাটির খুরি এসেছে প্রচুর। এখন ছেলেমেয়ের দল হুল্লোড় করে এলেই হয়।

বেলা বাড়ে।

সূর্যের তেজ কড়া হয়ে ওঠে।

নিমগাছের ডালে তেষ্টায় কাক ডাকতে থাকে।

কিন্তু চৌধুরী বাড়ির গেট পেরিয়ে একটি ছেলেও উৎসব প্রাঙ্গণে এসে হাজির হয় না।

বুড়ো কর্তা তামাক টানতে টানতে ঝিমিয়ে পড়েন। ব্যাপারটা যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না।

যে নেমন্তনের নামে ছেলেমেয়েরা সাত দিন আগে থাকতে নাচতে শুরু করে, তাদের একটি পুচকে শিশুও এগিয়ে এলো না চৌধুরী বাড়ি ?

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসে।

আকাশের আলো হলদে হয়ে ওঠে।

একটা কাকপক্ষী এসেও উঁকি মারে না চৌধুরীদের উঠোনে।

এত বড় সামিয়ানার তলটা যেন খা-খা করতে থাকে।

চিত্রক ছুটে এসে চোখ গরম করে চিৎকার করে উঠল। নাই বা খেলে গাঁয়ের মানুষ—আমরা হাট থেকে, গঞ্জ থেকে, নদীর ধার হতে ভিখিরী এনে খাওয়াবো।

দলে দলে লোক ছুটলো। হাটের পথে। নদীর ধারে। ভিখিরী পঙ্গু অনাথ-আতুরদের ডেকে নিয়ে আসতে।

কিন্তু কাউকে আজ খুঁজে পাওয়া গেল না।

তারা নাকি দলে দলে কোন বৈষ্ণবের মচ্ছবে চলে গেছে।

সেখানে ভক্তিগীতি গাইছে সুরদাস।

খবর শুনে চিত্রক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।

এত কলার পাতা থাকে থাকে সাজানো।

এত রকমারি খাবার রান্নাঘর জুড়ে।

কিন্তু খাবার কেউ নেই।

শুধু অন্ধকার আকাশে হাউই বাজিগুলো নিস্ফল আক্রোশে জ্বলে জ্বলে মাথা খুঁড়তে লাগল।

*

* *

সারাদিন ধরে দারুণ গুমোট সবাইকে যেন জ্বালিয়েছে। রাত্তিরেও এতটুকু হাওয়া ছাড়ে নি।

সবাইকার পরাণ একেবারে আই-ঢাই।

পৃথিবীর বুক থেকে কি হাওয়া চলে যাচ্ছে?

রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত জিব বের করে তেষ্টা মেটাবার জলের জন্য ল্যা-ল্যা করে সারা দেহ কাঁপিয়ে ধুক্ছে!

চৌধুরী বাড়ির নিমগাছটা যেন অন্ধকারের মধ্যে অটল প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার একটি পাতাও কাঁপছে না। পাতাগুলোও কি তাদের জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে?

গাঁয়ের নীরব শ্মশানে কাপালিক কি ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়ে মহা সমাধিতে মগ্ন হয়ে আছে?

চৌধুরী বাড়ির বুড়ো কর্তার চোখে এতটুকু ঘুম নেই। দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেছে!

একটা কাল্ প্যাঁচা চৌধুরী বাড়ির মাথার ওপর দিয়ে বিশ্রী সুরে ডেকে চলে গেল।

শুকনো খটখটে ডোবায় আর খানা-খন্দে ব্যাঙগুলো ডাকতে ভুলে গেছে। ওদের গলাও বোধ করি শুকিয়ে গেছে,

এই নিশুতি রাতে আকাশে একটা লাল আভা কেন? তবে কি সবার অজান্তে প্রলয় ঘনিয়ে এলো?

হঠাৎ সেই অন্ধকার রাত্রে।

বাসুকী মাথা নাড়া দিয়ে উঠল।

কী তার ঝাঁকুনি, কী তার দুর্দান্ত দাপট। চারিদিক থেকে শঙ্খধ্বনি হতে থাকল।

আর সেই সঙ্গে সবাইকার আর্ত চিৎকার।

ভুঁই কম্প! ভুঁই কম্প!! ভুঁইকম্প!!!

"কে কোথায় আছ, দালান ছেড়ে বেরিয়ে এসো।"

মাটির তলা থেকে কেবলই গুরু গুরু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, একদল দামাল দৈত্য প্রলয়কালের দামামা বাজিয়ে চলেছে, তার আর বিরাম-বিশ্রাম নেই!

পর মুহূর্তেই একটি কর্ণ-বিদারি শব্দে গোটা চৌধুরী বাড়ি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে দারুণ আর্তনাদ—বাঁচাও, বাঁচাও, মরে গেলাম, তুলে ধরো, টেনে তোলো। কিন্তু কে কার কথা শোনে, কে কাকে বাঁচায়?

অর্জুনের বাণে কি মাটির তলা থেকে সহস্রধারে গঙ্গা উঠে এলো? মুহূর্ত মধ্যে চারিদিক ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

যারা কোনরকমে প্রাণে বেঁচেছিল, তারা এই জলের তোড়ে ভেসে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দালান ভাঙার গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। যেন কোন্ অজানা

শত্রুপক্ষ অন্ধকারের ভেতর থেকে কামান দাগছে! বিরাট বিরাট গাছ সব ভেঙে পড়ে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিচ্ছে।

যে পালাতে যাচ্ছে, হোঁচট খেয়ে আবার পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে, এ যেন মৃত্যুর ফাঁদে মরণের শতরঞ্জ খেলা চলেছে!

কী আর্তনাদ, কী মরণ বিভীষিকা!

গোটা অঞ্চলটা যেন ভেঙে, গুড়িয়ে, জলে ভাসিয়ে কোন্ ক্ষ্যাপা দানব একেবারে তচনচ করে চলে গেল!

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

কিন্তু তখনো চারিদিক থেকে শুধু আর্তনাদ আর মরণ চিৎকার।

মৃতদেহে চারিদিক যেন একেবারে স্তূপ হয়ে গেছে! এই ধ্বংসাবশেষ ডিঙিয়ে চলে যাবার সাধ্য আজ করো নেই। কিন্তু তবু এই মৃত্যের রাজ্যে যেন কার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

"পথের পথিক করেছ আমারে
সেই ভালো ওগো সেই ভালো।
আলেয়া জ্বালালে প্রান্তর ভালে—
সেই আলো মোর সেই আলো।"

কে গাইছে?

যেন গলা মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ, সুরদাস গান গাইতে গাইতে এই সপুরীর মাঝখান দিয়ে চলে যাচ্ছে।

অন্ধকারের মাঝখান থেকে কে যেন বুকফাটা চিৎকার করে উঠল, সুরদাস, এদিকে এসো, আমায় বাঁচাও।

সুরদাসের কণ্ঠের গান স্তব্ধ হয়ে গেল।

এমন করে আমায় কে ডাকে? গলাটা যেন চেনাচেনা মনে হচ্ছে?

—আরি চিত্রক। সুরদাস, আমার হাত ধরো, আমি আর চলতে পারছি না। আমি অন্ধ হয়ে গেছি। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না! আমায় রক্ষা করো সুরদাস। এগিয়ে এসো, আমি গভীর গর্তে পড়ে গেছি।

সুরদাস এগিয়ে এসে দেখল তাই ত!

চিত্রক একটা প্রকাণ্ড গর্তের ভেতর পড়ে আকুপাকু করছে, তার আর পোষাক-পরিচ্ছদের জৌলুশ নেই।

কপালে, গালে, চিবুক কেটে গেছে।

তির্‌তির্‌ করে সেই সব জায়গা দিয়ে রক্ত পড়ছে।

—সুরদাস, তুমি কি এসেছ? আমার হাত ধরো। আমি এই গর্তের ভেতর পড়ে গেছি।

আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমি একেবারে অন্ধ হয়ে গেছি। এত দুঃখের মধ্যেও সুরদাস যেন শিউরে উঠল।

—তুমি অন্ধ হয়ে গেছ চিত্রক? কেমন করে এমন হল?

চিত্রক আর্তনাদ করে উত্তর দিল, কী একটা শক্ত জিনিস আমার চোখের ওপর এসে পড়ল। দারুণ আঘাতে আমি পড়ে গেলাম! অনেকক্ষণ পড়ে জ্ঞান ফিরে এলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, আমি চোখে দেখতে পারছি না। আমার দুই চোখই থেঁতলে গেছে আমি অন্ধ হয়ে গেছি। সুরদাস, আর আমি ছবি আঁকতে পারবো না।

সুরদাস আকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তোমার বাড়ির লোকজন কোথায়? এমন করে তোমায় একা একা ছেড়ে দিয়েছে?

চিত্রক উন্মাদের মতো হো-হো করে হেসে উঠল।

—বাড়ির লোকজন?

—তারা বাড়ি চাপা পড়ে আগেই মরে গেছে। কেউ আর বেঁচে নেই। আমি নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসছিলাম। এমন সময় কি একটা ভারী জিনিস আমাও চোখের ওপর এসে পড়ল, আমি জ্ঞান হারালাম। উঠে দেখি, আমি অন্ধ হয়ে গেছি। সুরদাস, আমরা আমাদের উঁচু বাড়ির বড় গর্ব করতাম। সেই বাড়িই আমার আত্মীয়-স্বজন সবাইকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। তুমি ছিলে পাতার কুটীরে, তাই তোমার কিছু হয় নি।

সুরদাস এগিয়ে এসে আন্তরিকতার সঙ্গে বললে, কোনো ভয় নেই

চিত্রক, আমি ত আছি, তুমি আমার হাত ধরো। গর্ত থেকে তোমায় টেনে তুলছি। একসঙ্গে আমরা পথ চলবো। একটা আশ্রয় নিশ্চয় জুটে যাবে।

চিত্রক ব্যাকুলকণ্ঠে কইলে, কিন্তু কি করে আমি পথ চলবো? আমি একেবারে দেখতে পাই নে?

সুরদার জবাব দিলে, কোনো ভয় নেই চিত্রক আমার চোখ দিয়ে তুমি সব কিছু দেখাত পাবে। আমার হাত ধরে তুমি চলবে।

চিত্রক কুণ্ঠিত হয়ে কইলে, তোমার আমি হু'চক্ষে দেখতে পারতাম না। সবার সামনে কত হেনস্থা তোমায় করেছি। তাই আমার এই সাজা। তোমায় আমি মানুষ বলেই মনে করতাম মুখের দিকে চাইতে আমার ঘৃণা হত। কিন্তু তুমি ত আমায় কোনদিনকটূ কথা কও নি! আজ বুঝতে পারছি; তুমি গরিব হলে কি হবে? তোমার মনটা কত বড়!

সুরদাস থমকে থামিয়ে দিয়ে বললে, ও-সব কথা থাক ভাই। আমরা ত সহপাঠি, এক ক্লাসে পড়ি। সেইখানেই ত' আমাদের বন্ধুতা। চলো, আগে তোমার চোখ হু'টি ঠাণ্ডা জলে ভালো করে ধুইয়ে দিই।

সুরদাসের হাত ধরে চিত্রক এগিয়ে চলে। সামনেই একটি পুকুর। হুই বন্ধু সেই পুকুরের ধারে গিয়ে বসল।

সুরদাস কইলে তুমি এইখানে বোসো ভাই, আমি কুচুর পাতা করে জল নিয়ে আসি।

চিত্রক চোখে জল ফেলে বললে, এত তোমার দয়া? আমি এত দিন মোহে অন্ধ হয়েছিলাম। তার তোময় চিনতে পারি নি। তোমার মুখের দিকে আমি তাকাই নি। আজ তোমার মুখখানি তামার দেখতে ইচ্ছে করছে।

সুরদাস উত্তর দিলে দেখবে বৈকি। একদিন তোমার চোখ আবার ভালো হয়ে যাবে। আমরা শহরে যাবো। সেখানেগান গেয়ে ভিক্ষে করে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো। তখন তুমি আবারদেখতেপারবে।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে চিত্রক উত্তর দিলে, তুমি এত ভাল? তোমার এত দয়া? আগে আমি এতটুকু বুঝতে পারি নি। আমার সাথীরাই আমাকে ভুল বুঝিয়েছে। তখন ভাবতাম, তোমার চাইতে বড় শত্রু আমার কেউ নেই। আজ বুঝতে পারছি, তোমার চেয়ে বড় মিত্র আমি আর কোথায় খুঁজে পাবো?

সুরদাস শুধু বললে আমি তোমার চিরদিনের বন্ধু।

সুরদাস জল দিয়ে চিত্রকের চোখের ক্ষত ভালো করে ধুইয়ে দিলে। কি একটা গাছের পাতা যোগার করে এনে নিজের গামছা দিয়ে চিত্রকের চোখ দুটো ভালো করে বেঁধে দিলে। চুপি চুপি কইলে, ঐ গাছের পাতা চোখ ঠাণ্ডা রাখে। আমার ঠাকুমা শিখিয়ে দিয়েছিল। এইবার তুমি একটু আরাম পাবে। চলো, তোমায় একটা নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে যাই। চারিদিকে কত বড় বড় গাছ যে ভেঙে পড়েছে, পথ চলাই দায়! আমার হাত ধরো, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসো।

চিত্রক ওর হাত ধরে এগুতে এগুতে জিজ্ঞেস করলে, আমাদের সেই চিরচেনা গাঁকে বুঝি আর আদৌ চেনা যাচ্ছে না? বল ত' সুরদাস এখানকার চারিদিকের অবস্থাটা এখন কি রকম দাঁড়িয়েছে?

অবস্থা উত্তর দিলে, অবস্থা অতি ভীষণ। আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মোটা মোটা গাছ উপরে পড়ে আছে! আশে-পাশে অনেকগুলি ছেলেমেয়ের মৃতদেহ চেপটে গেছে। ও-দিকে দুটো কুকুর মরে পড়ে আছে। এদিকে গরম জলের ফোয়ারা উঠছে। যারা চা খায়, তাদের ভারী সুবিধে হত। কিন্তু আশেপাশে কেউ বেঁচে নেই।

গাছের ওপর এক পাল পাখি। কিচিরমিচির শব্দ করছে। দূরে ঝোপের আড়ালে কয়েকটা শয়তান শেয়ালের লোভী চোখ দেখা যাচ্ছে। ওরা বোধ হয় মরা মাংস খেতে আসছে।

চিত্রক ববলে, তা হলে আমরা শ্মশানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি?

সুরদাস উত্তর দিলে, ঠিক তাই।

—আমাদের সেই চিরচেনা গ্রাম এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

চেনা মানুষ, জীবন্ত লোক, একটিও দেখতে পাচ্ছি না। তবু এই মরণের মাঝখানেই আমাদের বাঁচার গান গাইতে হবে। হতাশ হলে চলবে না ভাই চিত্রক। ধ্বংসের মাঝখান থেকেই ত' সৃষ্টি হবে। এই পৃথিবীর নিয়ম।

সুরদাস আবার উদাসকণ্ঠে গান ধরল—

"পথের পথিক করেছ আমারে—
সেই ভালো ওগো সেই ভালো!

*

* *

সুরদাস চিত্রকের হাত ধরে অতি সাবধানে এগিয়ে নিয়ে চলল। বেশ কিছুটা পথ চলার পর সুরদাস মৃদু কণ্ঠে কইলে, চিত্রক, আর আমাদের এ গ্রামে থাকলে চলবে না। আস্তে আস্তে শহরের দিকেই পা চালিয়ে চলতে হবে। কারণ এ গাঁয়ে থাকলে খাবার অভাবে না খেয়েই আমাদের মরতে হবে।

চিত্রক উত্তর দিলে, ভাই সুরদাস, এতদিন তোমাকে শত্রু ভেবেছি, তোমার অনিষ্ট করবার জন্য রাত জেগে কত ফন্দী এঁটেছি। আজ ভগবান আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, বড় দালান ভেঙে পড়তে পারে, যাদের আত্মীয়স্বজন বলি, তারা চোখের পলকে মরে যেতে পারে। ধনদৌলত মুহূর্তে মধ্যে ধুলোমুঠি হয়ে যেতে পারে। আর যাকে চিরকাল শত্রু মনে করতাম, সেই মানুষটি নীরবে এসে প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারে।

সুরদাস উত্তর দিলে, এখন ওসব থাক ভাই। কে শত্রু, আর কে মিত্র, তার শেষ পরীক্ষা ত এখনো হয় নি ভাই।

তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বাসিত হয়ে কইলে, দেখ দেখ, যে ভগবান ধ্বংস করে সেই আবার পথের পাশে বাঁচাবার উপায় করে দেয়।

চিত্রক জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি সুরদাস?

সুরদাস হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, পথের পাশে একটা জাম গাছ উপড়ে পড়ে আছে। গাছ ভরতি কালো কালো পাকা টস্‌টসে জাম

রয়েছে। আমি কুড়িয়ে আনি, কত খাবি খেয়ে নে। হয়ত আজ কপালে আর কিছু জুটবে না।

সুরদাস অনেক জাম কুড়িয়ে নিয়ে এলো।

চিত্রক সেই জাম মুখে তুলে দিয়ে বললে, জাম যে এত মিঠে হতে পারে, সে কথা আগে জানা ছিল না। বাড়িতে থাকলে হয়ত তাকিয়েও দেখতাম না। কিন্তু আজ এই চরম বিপদের মধ্যে বন্ধুর দয়ায় জানতে পারলাম যে ভগবান ভয়ঙ্কর, তিনি আবার স্নেহশীলও বটে। নইলে এমন মিষ্টি জাম তৈরী হয়।

সুরদাস কোঁচড় ভরতি করে জাম কুড়িয়ে নিল।

তারপর কইলে, চিত্রক, তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও। পাশেই একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে, আমি এইখানেই স্নানটা সেরে নি। পুকুরের জলে স্নান করলে তোমার হয়ত সহ্য হবে না। শান্ত ছেলের মতো এইখানে চুপচাপ বসে থাকো দেখি।

সুরদাস দূর থেকে চিৎকার করে কইলে, ভূমিকম্পের দারুণ দাপটে পুকুরের জলও গরম হয়ে গেছে। কিন্তু স্নান করতে বেশ মজা লাগছে। শীতের দিন হলে আরো আরাম হত !

চিত্রক আবদার করে বললো, সুরদাস, তোমার সঙ্গে আজ আমিও স্নান করবো। সারা গায়ে কাদা মাখামাখি হয়ে আছে। এই গরম জলে স্নান করলে, সেই হবে আমার মুক্তি স্নান। আমি তোমার দয়ায় নতুন জীবন খুঁজে পাবো।

সুরদাস প্রবল আপত্তি করে কইলে, আমার দয়া বলছ কেন চিত্রক ? যিনি দয়া করার আসল মালিক, তিনি ওপরে বসে হাসছেন। ভাঙছেনও তিনি গড়ছেনও তিনি।

তারপর পরম স্নেহে হাত বাড়িয়ে বললে, এসো আমি তোমায় এই গরম জলেই স্নান করিয়ে দি।

তখন দুই বন্ধু মিলে খুব আরাম করে স্নান করল। গায়ের কাদা-ধুলো ময়লা সেই সেই গরম জলেই ধুয়ে গেল।

সুরদাস বললে, গামছায় বাঁধা তোমার ওই চোখের ওপরকার

পাতাগুলো কিন্তু ফেলে দিও না। আমার ঠাকুমা বলত, চোখের যে কোন অসুখে এ একেবারে ধন্বন্তরী। সারাক্ষণ চোখ ঠাণ্ডা রাখে।

চিত্রক মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, ঠিক কথা। সেই যে দারুণ জ্বলুনিটা ছিল সেট, একেবারে কমে গেছে। মনে হতে কে যেন ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিয়েছে।

সুরদাস উত্তর দিলে, ঠিক কথা। আমাদের দেশের গাছগাছড়ার অনেক গুন। আমরা কেউ বিশ্বাস করি না, তাই।

অনেকক্ষণ ধরে তুই বন্ধু কুসুম-কুসুম গরম জলে স্নান করল। মনে হল দেহের কাদা আর ধুলোবালির সঙ্গে মনের ময়লায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।

তারপর তুইজনে পুকুরের পাড়ে উঠে বসলো।

সুরদাস কইলে, এই ভেজা কাপড় কিন্তু গায়েতেই শুকিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা চিত্রক, সেটা কি তোমার সহ্য হবে ?

চিত্রক হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, এখন সবই সহ্য করতে হবে। আমাদের পণ্ডিতমশাই কি শ্লোক আওড়াতেন, সেটা তোমার মনে নেই ?

"সমুদ্রে পতিত শয্যা
শিশিরস্থ কুতো ভয়ম্ ?

সমুদ্রে যখন বিছানা পেতেছি, তখন শিশিরের ভয় পেলে চলবে কেন ?

সুরদাস কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু রসিকতা করতে ছাড়ল না। বললে, দেখ চিত্রক, এখানে ন্যাংটো হ্য়ে গাছের ডালের সঙ্গে ভিজে কাপড় মেলে দিলে কেউ দেখতে আসবে না। দূরে ঝোপের আড়ালে কয়েকটি শেয়াল শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের দেখা কেউ এখানে পাবে না। যারা আছে সব মাটিতে পড়ে আছে। আর সেয়ানা শেয়ালগুলো ভোজের জন্য ওৎ পেতে রয়েছে। আমরা একটু সরে পড়বে, আর ওরাও মরাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সারারাত যেমন গুমোট ছিল, এখন দিনের বেলা তা নেই। দিব্যি

হাওয়া দিয়েছে। মাথাল ওপর পাখীগুলিই শুধু কিচিরমিচির করে এ-ডাল ও ডাল করছে। শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে অগুন্তি। এত দুঃখের মধ্যেও ওদের দুই বন্ধুর মাথার ওপর কে যেন আশীর্বাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

হাওয়া ছিল বলে তাড়াতাড়ি দুই বন্ধুর ভেজা কাপড় শুকিয়ে গেল। ওরা আবার ধুতি পরে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হল।

সুরদাস বললে, স্নান যখন হল তখন জলযোগটাও সে নেয়া যাক। স্নানের আগে পাকা জামগুলো পুকুরের ধারে জড় করে রেখে গিয়েছিল! আশেপাশের আম গাছে কয়েকটি পাকা আমও পাওয়া গেল। সুরদাস সেইগুলি যোগাড় করে নিয়ে এলো।

তারপর পুকুরের কুসুম-কুসুম গরম জলে ফলগুলো ধুয়ে নিয়ে ওরা ফলার করতে বসল। কচুপাতায় দিব্যি জমে উঠলো ফলার।

অনেকগুলি পাকা ফল খেয়ে ওদের পেট ভরে গেল। চিত্রক বললে, এখন বেশ বুঝতে পারছি, অতীত যুগের ভারতবর্ষের মুণি-ঋষিরা কিভাবে ফল খেয়ে দারুন তপস্যা করতেন।

সুরদাস কইলে সে কথা সত্যি। মুনি-ঋষিরা নিজেদের প্রয়োজন কতটা কমিয়ে এনেছিলেন, তাই ত তাঁরা সারা জীবন ধরে ধ্যানধারনা আর সাধনা করতে পারতেন।

চলো, আমরাও হারা উদ্দেশ্যে বনের দিকে পথে রওনা দি। সুরদাস আবার উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরল।—

"পথের পথিক করেছ আমাকে
সেই ভালো ওগো সেই ভালো।
আলেয়া জ্বালালে প্রান্তর ভালে
সেই আলো মোর সেই আলো॥"

একটা গ্রাম ছাড়িয়ে ওরা দুইবন্ধু আর একটা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হল।

এখানেও ভূমিকম্পের ধ্বংসাবশেষ চারদিকে ছড়ানো। অনেক পাকা বাড়ি ধ্বসে পড়েছে।

চারিদিকে বড় বড় ফলন্ত গাছ শিকড়শুদ্ধ উপড়ে পড়েছে। সেই সব গাছে রাশি ফল ঝুলছে।

সুরদাস বললে, এখানে রাশি রাশি ফলন্ত গাছ ভেঙে পড়েছে। কিছু ফল পথের সঞ্চয় হিসাবে সংগ্রহ করা যাক। তুমি বন্ধু এই দাওয়ার ওপর একটু বোসো।

সুরদাস চিত্রককে একটি দাওয়ার ওপর বসিয়ে দিয়ে ওদিকে কোথায় চলে গেল।

খানিকবাদে ফিরে এসে চেঁচিয়ে বললে, চিত্রক আমাদের ভাগ্যি ভালো বলতে হবে। একটা সুন্দর থলে পাওয়া গেছে। এইটে ভরতি করে ফল সংগ্রহ করে রাখি।

চিত্রক তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, সেই ভালো। ঐ যে পণ্ডিতমশাই আমাদের ক্লাসে পড়াতেন, সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে। এখন সেটা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে চিত্রক বললে, এই সময় আমি তোমাকে বেশ কিছুটা সাহায্য করতে পারতাম। কিন্তু এমনি আমার দুর্ভাগ্য যে কিছুই করতে পারছি না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার কইলে, হয়ত চিরকালের জন্যে তোমার গলগ্রহ হয়ে রইলাম।

সুরদাস ওকে সান্তনা দিয়ে কইলে, আরে ভেঙে পড়ছ কেন? তুমি কি চিরকালই চোখে দেখতে পাবে না ভাবছ? এটা একটা দুর্ঘটনা বৈ ত নয়। আমরা শহরে যাবো। সেখানে যে করেই হোক, তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো। দেশে এখন কত রকম হাসপাতাল হয়েছে তার খোঁজখবর নিতে হবে।

চিত্রক আবার আক্ষেপের সুরে কইলে, দেখ ভাই সুরদাস, আগে বুঝতে পারতাম না, এখন উপলব্ধি করছি যে, মানুষের মনের মধ্যেই স্বর্গ আর নরক লুকিয়ে আছে। তখন তোমার মুখের দিকে চাইতে আমার কেমন যেন ঘৃণা হত। এখন চোখে দেখতে পারছি না, এখন মনে হচ্ছে, তোমার ওই সরল সুন্দর মুখখানি ঘিরে স্বর্গের সুষমা মাখা আছে।

সুরদাস হেসে তার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললে, চিত্রক, ওটা ভাই তোমার বাড়াবাড়ি। আমি আগেও তোমার বন্ধু ছিলাম, এখনও তাই আছি। স্বর্গের সুষমা-টুষমা কোথায় পাবো বল? আমার কি মনে হয় জানো তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে নানা ধরনের কবিতা লিখতে। আগে ত ছবি আঁকতে আর সেই ফাঁকে ফাঁকে কবিতাও লিখতে, যেটা আমরা কেউ জানতাম না।

চিত্রক মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, পাগল আর কারে বলে! তবে আমরা যে একটা কবিতাতে পড়েছিলাম, পরশমণির ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়, সে-কথা নেহাত কল্পনা নয়, সত্যি। এখন সেটা মনে মনে অনুভব কর্‌তে পারছি।

সুরদাস কৌতূক করে কইলে, এ ত কবিতার কথা। নাঃ, দেখছি তুমি ভেতরে ভেতরে সত্যিকারের কবি।

ইতিমধ্যে উপড়ে পড়া গাছগুলি থেকে বহু ফল সুরদাস সংগ্রহ করে ফেলেছে।

ওরা হাত ধরাধরি করে আরো খানিকদূর এগিয়ে গেল। হঠাৎ কার যেন কান্না শুনে ওরা দুই বন্ধু থমকে দাঁড়াল। একটি বৃদ্ধা মহিলা চিৎকার করছে, কে এদিকে আসছো, আমায় বাঁচাও।

ছুটে গিয়ে দেখা গেল, একটি বৃদ্ধা ঘর চাপা পড়েছে। সুরদাস ব্যস্ত হয়ে বললে, বন্ধু, একটু দাঁড়াও। ওই বুড়ীটা চাপা পড়েছে, ওকে বাঁচাতে হবে।

চিত্রককে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে সুরদাস ছুটে গেল।

ঘরের একটা কাঠের খুঁটিতে বৃদ্ধা চাপা পড়েছিল। সুরদাস গিয়ে টানাটানি করে বুড়ীকে কোনো রকমে মুক্ত করল। বুড়ী দু'হাত তুলে আর্শীর্বাদ করে বললে, তুমি আমায় মরনের হাত থেকে বাঁচিয়েছ। ভগবান তোমায় ভালো করুন।

একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বৃদ্ধা বললে, আজ আমার ছেলের ফেরবার কথা ছিল,। জানি না সে আবার কোথায় আটকে পড়েছে। ওর জন্যে আমি অনেক খাবার করে রেখেছি। ওই রান্নাঘরে ঢাকা আছে।

তোমরা সেই খাবার পেট পুরে খাও। তাহলে আমার মনে তৃপ্ত হবে তোমরা দেবদূত, এসে আমার প্রাণ বাঁচালে।

*

* *

প্রথমে বৃদ্ধাকে কিছু খাইয়ে সুরদাস তাকে সুস্থ করে তুলল। বুড়ী কেবলি তার ছেলের কথা বলে আফসোস করছিল।

সুরদাস জিজ্ঞেস করল, বুড়ীমা, তোমার ছেলে কোন্ পথে বাড়ি ফিরবে কথা ছিল।

বুড়ী মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, নৌকো করে আসবে বাছা। অনেকক্ষণ আগেই এসে পৌঁছুবার কথা। কিন্তু এখনো যে কেন এলো না, কিছুতেই বুঝতে পারছি না। পথে কি কোনো বিপদ হল?'

সুরদাস বুড়ীকে বুঝিয়ে বললে, শোনো বুড়ীমা, তোমার ছেলে যখন নৌকো করে আসবে, তখন কোনো ভয় নেই। কারণ ভূমিকম্প যখন হয়, মাটি ফেটে চৌচির হয়। বড় বড় দালানকোঠা ভেঙে পড়ে। কিন্তু নদীর ওপরে থাকলে নৌকোটা শুধু একটু দোলে। নদীর বুকে অনেক সময় বোঝাই যায় না যে, ভূমিকম্প হচ্ছে। সেইজন্য ভূমিকম্প হলে অনেকে নৌকোর ওপর আশ্রয় নেয় আমি বলছি, তোমার ছেলে যখন নৌকো করে বাড়ী আসছে, তখন কোনো ভয় নেই। আমরা অপেক্ষা করি। ছেলে এসে পড়ল বলে।

খানিকবাদেই দেখা গেল, ছেলে নৌকাকরে এসে উপস্থিত হয়েছে। মায়ের বিপদের কথা শুনে,আর তার উদ্ধারের কাহিনী শুনে ছেলে দুই বন্ধুকে খুব ধন্যবাদ দিল।

তখন তিনজনে বসে বুড়ীর তৈরী করা খাবারগুলি সাবার করে ফেলল।

অনেক রাত হয়ে গেছে!

বুড়ীর ছেলে একটি শতরঞ্জি বিছিয়ে নিল।

আগে বুড়ীকে তার খাটে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর

তিনজনে মেঝেতে সেই শতরঞ্জির ওপর শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল। তিনজনেই খুব পরিশ্রান্ত ছিল। তাই এক ঘুমে রাত শেষ হয়ে গেল।

খুব ভোরে সুরদাসের ঘুম ভেঙে গেল। ধীরে ধীরে চিত্রককে ডেকে তুলল! বললে, আমরা এদের আর না জাগিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ব। রোদ উঠে গেল হাঁটতে খুব অসুবিধা হবে।

চিত্রক মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, সেই ভালো।

তখন দু'জনে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওদের জানাতে গেলে কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়তো না। অকারণে অনেক দেরি হয়ে যেতো। গনগনে রোদ্দুর উঠে যেত মাথার ওপরে।

সুরদাস তাকিয়ে দেখলে, খাটের ওপর বুড়ীমা আর মেঝেতে ছেলে দিব্যি আরাম করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। ওদের ত আর তাড়াতাড়ি ওঠবার কোন গরজ নেই। তাই নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

খুব ভোরে পথ চলার ভারি আনন্দ, একটামিঠে হাওয়া বয়ে শরীরকে শীতল করে দেয়। গাছের ডালে পাখ-পাখালি মধুর সুরে ডাকছে।

নদীর ধার দিয়ে ওরা এগিয়ে চলে। চলতে চলতে ওরা দেখল, অনেক জায়গায় জমিতে ফাটল ধরেছে। কত বড় বড় গাছ চারদিকে ভেঙে পড়েছে। মৃতদেহের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। চারদিকে ছড়ানো।

নদীর দিকে তাকিয়ে সুরদাস দেখলে নৌকোগুলো মন্থর গতিতে চলেছে। ওদের যেন কোনো কাজে বিশেষ তাগিদ নেই। ধান বোঝাই বিরাট বিরাট নৌকোগুলো পাল তুলে এগিয়ে চলেছে। সুরদাস তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, আর আপন মনে পথ চলে।

চিত্রক জিজ্ঞেস করল, এখন আমরা কোথা দিয়ে চলেছি সুরদাস?

সুরদাস উত্তম দিল, এখন আমরা নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছি। দিব্যি ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুঝতে পারছ, নদীর কুলকুল ধ্বনি শুনতে পাচ্ছ, আর দূর থেকে মাঝির ভাটিয়ালি গান ভেসে আসছে। আমার কিন্তু বেশ ভালই লাগছে। তুমি সাবধানে আমার হাত ধরে এগিয়ে এসো।

আর একটু দূরে এগিয়ে গিয়ে সুরদাস থমকে দাঁড়াল। চিৎকার করে উঠল, উস! ছ'চোখে দেখা যায় না!

চিত্রক জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে বন্ধু? তুমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

সুরদাস বললে, একেবারে মর্মান্তিক দৃশ্য। মা-টা মরে গেছে। আর তার বুকের ওপর শুয়ে একটি অবোধ শিশু সেই মরা মায়েরবুকের হুধ টেনে টেনে খাচ্ছে। বিধাতাকে ডেকে এনে দৃশ্যটা দেখাতে হয়। কি করুণ, আর কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

চিত্রক ব্যস্ত হয়ে বললে, তা হলে কি করা যাবে? ওই শিশুটিকে কি বাঁচানো যায় না?

সুরদাস হাসতে হাসতে উত্তর দিলে,বাঁচাবার মালিক কি আমরা? যিনি সবার আড়ালে বসে গড়ছেন আর ভাঙছেন,তাঁকে জিজ্ঞেস করো।

চিত্রক অসহায়ের স্বরে হতাশ হয়ে কইলে, তা হলে আমরা এই শিশুটিকে ফেলেই চলে যাবো? কিছুই করতে পারবো না? অবশ্য একথা বলাই আমার বোকামি। একটা বোঝা ত আগেই তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি। তার ওপর আর একটি বোঝা যদি কাঁধে ওঠে তা হলে তুমি পথ চলবে কি করে?

সুরদাস কইলে, আচ্ছা, যতদূর পারি নিয়ে ত চলি, পথের মধ্যে কোনো মায়ের যদি কৃপাদৃষ্টি পড়ে।

সুরদাস শিশুটিকে নিজের কোলে তুলে নিলে।

ওরা এগিয়ে চলেছে অজানা পথে।

সুরদাসের কণ্ঠে সেই গান=

"পথের পথিক করেছ আমারে
সেই ভালো ওগো সেই ভালো"

বন-বাদাড় ভেঙে, উপড়ে-পড়া গাছ ডিঙিয়ে খানাখন্দ গর্ত এড়িয়ে ওরা অতি কষ্টে এগিয়ে চলে। জনমানবশূন্য পথ। আহা বলে ডাক দেবার কেউ নেই!

এইভাবে চলতে চলতে ওরা লোকালয়ের নিকটে এসে পেঁছুল।

ইতিমধ্যে শিশুটি কাঁদতে শুরু করেছে। মৃত মায়ের বুকে হুধ ছিল

না। তার ওপর এতক্ষণ ধরে কিছুই খেতে পাই নি। শিশুটির গলা বুক বোধহয় শুকিয়ে উঠেছে! কেঁদে প্রতিবাদ জানার শক্তি যে আছে এই ত ঢের। এমন সময় এক অবাক্ কাণ্ড!

উন্মাদিনী এক নারী কোথা থেকে যেন ঝড়ের মতো উড়ে এলো। চিৎকার করে কইলে, এই আলার হারানো মানিক। বুকের ধন। —তুই নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিস কেন?

সেই নারী ছোঁ মেরে যেন শিশুকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল।

সুরদাস হো-হো করে হাসতে লাগল। দেখল ত মজার খেলা। বুঝলে কিছু? যিনি সমস্যার সৃষ্টি করলেন, তিনিই সাবধান করে দিলেন। জগৎ জুড়ে এ এক আজব খেলা চলেছে। কতটুকু আমাদের দৃষ্টি চলে? কোন্ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই। এ ব্যাপারে আমরা সকলেই অন্ধ।

আবার দুই বন্ধু হাত ধরাধরী করে পথ চলে, ওরা চলেছে আর চলেছে।

পথের কি আর শেষ আছে?

হঠাৎ দুশমনের মনো দশাসই চেহারায় একটি লোক তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালো।

—তোমাদের কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে।

সুরদাস ওর সেই মূর্ত্তি দেখে রসিকতা করে কইলে, কেন বাপু তুমি কি নরবলি দেবার ব্যবস্থা করেছ নাকি? নধর শিশু খুঁজে বেড়াচ্ছ?

দুশমনের মতো লোকটি তার হাতের লাঠি ঠুকে বললে, শোনো তোমাদের বলি ঃ আমাদের গিন্নীমা ব্রত করেছেন। এই ব্রত শেষ হলে আগে দু'জন অতিথিকে ভোজন করাতে হবে। গিন্নীমার ব্রত শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু উপযুক্ত অতিথি এখনো পাওয়া যায় নি।

সুরদাস কৌতুক করতে ছাড়লে না।

—তা বাবা দানো- কি করে বুঝলে আমরা উপযুক্ত অতিথি?

দুশমনটা উত্তর দিলে, গিন্নীমা বলে দিয়েছেন, যাদের দেখবি মুখ

শুকনো, না খেয়ে আছে, আর বয়সে কম, তাদেরই সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।

সুরদাস তার কথা শুনে হাসতে লাগল। বললে, তাহলে শোনো বলি দানো, আমাদের শুকনো মুখ দেখে তুমি ঠিক অনুমান করেছ যে পেটে এখানে দানাপানি জোটে নি! মুখ শুকনো থাকবে, নাকি ঢলঢলে হবে? তা তোমাদের গিন্নীমা ব্রত সেরে আমাদের ভালোমন্দ খেতে দেবেন ত? দেখো বাবা দানো কথা যেন ঠিক থাকে। আবার নরবলি দেবার ব্যবস্থা করে বোসো না যেন। বেমক্কা মরতে আমাদের ভারি আপত্তি!

সেই দুশমনটার পেছনে পেছনে ওরা দুই বন্ধু এগিয়ে চললো!

একটা সুর পায়ে চলার পথ।

দুধারে অনেক ঝোপ জঙ্গল আর তেঁতুল গাছের ভিড়। তারই ভেতর দিয়ে ওরা এগিয়ে চললো।

এখানে খুন করে পুঁতে রাখলেও দেখবার কেউ নেই!

আরো কিছুদূর চলার পর একটি হাড়গোড় বেড় করা জীর্ণ পুরোন বাড়ি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষজন খুব কম।

তবে কিছু হাড্ডিসার কুকুর বেড়াল জুটেছে।

আর গাছের ডালে পাখ-পাখালির ঐক্যতান চলেছে।

দুশমন লোকটার পিছনে পিছনে ওরা দুই বন্ধু গিয়ে হাজির হল।

একজন ফর্সা মোটাগিন্নীবান্নি বয়স্কা মহিলা এগিয়ে এসে কইলেন, ও! তোমরা এসে পড়েছ! আমার ব্রতও শেষ হয়ে গেছে।

তিনি হাঁক দিলেন ওরে বাসুকীর মা, এই ছেলে দু'টির জল পায়ে ঢেলে দে। দুটো গামছা নিয়ে আয়।

তারপর সুরদাস আর চিত্রকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আহা! বাছাদের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। নিশ্চই তোমরা উপোস করে আছ?

সুরদাস কৌতুকের সুরে জবাব দিলে, আমরা উপোস করে না

থাকলে আপনার ব্রতের পালন হবে কি করে? কিন্তু মা, খিদের আমাদের পেট জ্বলে যাচ্ছে। কি দেবেন চটপট্ দিয়ে ফেলুন।

গিন্নীমা কইলে এসো হাত-পা ধুয়ে দালানের ভেতরে এসো। আমি তোমাদের ঠাঁই করেই—রেখেছি।

দুই বন্ধু তখন অন্দরে ঢুকে দেখে প্রচুর আয়োজন। মুড়ি-মুড়কি ফল-ফলারি। ওদিকে ক্ষীর, দৈ, দুধ ছানা, পায়েস, মণ্ডা-মেঠাই—কিছু আর বাকী নেই।

সুরদাস সোৎসাহে বললে, আপনি সত্যি আমাদের মা। নইলে খিদের সময় আপনার দানোটা আমাদের ধরে নিয়ে এলো। ভাবলাম, নরবলি দেবে বুঝি।

গিন্নীমা শিউরে উঠে কইলেন, ষাট! ষাট! ও-কথা কি বলতে আছে? তোমরা এসেছ তাই আমাদের ব্রত পালন হল।

সুরদাস। চিত্রকের পিঠে এক ঠেলা মেরে বললে, নাও, এখন ঠেলা সামলাও। কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা খাবে, সেইটেই সমস্যা। দাঁড়াও, আমি তোমায় সাহায্য করি!

*

* *

পরদিন গিন্নীমার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া ওদের পক্ষে খুব সহজ হয় নি।

গিন্নীমা ওদের বুঝিয়ে বললেন, দেখ ছেলেরা, তোমরা আমার কাছেই থেকে যাও। আমার ত তিন কুলে কেউ নেই। এই ব্রত-পার্বণ নিয়েই বেঁচে থাকি। তোমাদের দেখেও মনে হচ্ছে বাড়ি ঘরদোর খুইয়ে তোমরা পথে পথে ভেসে বেড়াচ্ছ। কী দরকার এমন খর স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে বেরাবার? তার চাইতে আমার ছেলের মতো এই বাড়ীতেই থেকে যাও। এই গ্রামে একটি ইস্কুল আছে। সেইখানেই তোমাদের ভর্তি করে দিচ্ছি। পড়াশোনা করো, খেত-খামার দেখো, আর এই বুড়ীমাকে আগলে থাকো।

সুরদাস তার জবাবে কইলে, মায়ের কথা শুনে মনে হচ্ছে, এই

মায়ের স্নেহের কোল ছেড়ে আর যেন দূরে যেতে না হয়। কিন্তু একটা খুব জরুরী কাজে আমাদের শহরে যেতেই হবে। এই যে আমার বন্ধুটিকে দেখছেন হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় ও একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। শহরে গিয়ে ওর চোখের চিকিৎসা করতে হবে। চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতেই হবে। নইলে ওর সারা জীবনটা অকেজো হয়ে যাবে। আপনি মা নিশ্চয়ই সব কিছু বুঝতে পারছেন।

গিন্নীমা বললেন, চোখের কথা যখন বলছ, তখন আর তোমাদের বাধা দিতে পারি না। চক্ষু রত্ন বলে কথা!

গিন্নীমাকে অনেক করে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ওরা আবার রওনা হল শহরের দিকে।

পথের কি আর শেষ আছে?

কখনো খেয়ে, কখনো না খেয়ে, আর কোন সময় পথে হোঁচট খেয়ে ওরা এগিয়ে চললো শহরের দিকে।

এ যেন কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুই বন্ধুর তীর্থযাত্রা। পথ চলতে গিয়ে সুরদাসের কণ্ঠে সেই গান—

"পথের পথিক করেছ আমারে—
সেই ভালো ওগো সেই ভালো।"

পথের পাশে যে শোনে থমকে দাঁড়ায়।

আহা! ছেলেটির এমন মিষ্টি গলা? ওর কি সংসারের কেউ নেই? কেউ বাড়িতে ডেকে নিয়ে আরো গান শুনতে চায়।

কিন্তু সুরদাসের সময় কোথায়? শহরে তাদের পৌঁছুতেই হবে।

অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে ক্ষত-বিক্ষত চরণ যুগল নিয়ে ওরা শহরের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলো। তারপর জনতার কোলাহলে দুই বন্ধু মিশে গেল।

এই জনারণ্যের মাঝখানে কোথায় তারা দাঁড়াবে? কোথায় আশ্রয় পাবে?

ওরা দেখল, ফুটপাতে অনেক ভিখারী রাত্রে শুয়ে থাকে। কিন্তু

তাদের নিজেদের মধ্যে সীমানা ভাগ করা আছে। ওখানে তারা নবাগতকে মাথা গলাতে দেবে না।

সুরদাস আপন মনেই বলে, এত বড় শহর, আর আমাদের ঠাঁই মিলবে না? খুঁজে খুঁজে এক পুলের নীচে ঠাঁই আবিষ্কার করা হল। সেখানে বড় বড় লোহার চোঙা শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তার ভেতর ঢুকে দিব্যি টান টান হয়ে শুয়ে থাকা যায়। একটা ছোটখাটো কামরাই যেন। পুলে নীচে বলে নিরিবিলি, বেশী ঝঞ্ঝাট নেই।

ভিক্ষে করতে দুই বন্ধুরও দারুণ আপত্তি। আর তা ছাড়া ওদের দু'জনকে ভিক্ষে দেবেই বা কে?

অক্ষম, অশক্ত বৃদ্ধ হলে লোকে দয়াপরবশ হয়ে ভিক্ষে দিতে পারে। কিন্তু দু'টি তাজা কিশোরকে কে সিকিটা, দোয়ানিটা ভিক্ষে দিতে যাবে।

হয়ত মুখের ওপর বলেই বসবে, : খেটে খাও গে। কুলিগিরি করো, আর না হয় চায়ের দোকানে আর হোটেলে বয় হয়ে চাকরি করো।

ওরা ও-পথে আদৌ গেল না।

সুরদাস বললে, পথের ধারে গামছা পেতে গান শুরু করে দেবো, তারপর অদৃষ্টে যা থাকে—।

ওরা একটি জনবহুল জায়গা বাছাই করে নিল।

সামনে বাজার। নানারকম লোক সওদা নিয়ে আসছে। তা ছাড়া ঠেলাগাড়ি করে কতরকম আনাজ, তরকারি, ডাব, ফল, মাছ আসছে। ক্রেতাদের যাতায়াত, গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়। বাবু, বিবিদের আনাগোনা। ফুটপাথের এক কোণে একটি আধবয়সী লোক আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছে। সামনের পাতা কাপড়ে কখনো পয়সা বা আনি-দোয়ানি পড়ে। বেহালা বাজনা যে কেউ দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে শোনে তা মনে হয় না।

সুরদাস সেই কোণে ফুটপাথের একান্তে তারা গামছা বিছিয়ে নিলে।

বেহালাবাদক একবার বাঁকা চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে টিপ্পনী কাটলে, তোমরা আবার এখানে মরতে এলে কেন? কিন্তু সোজা বলে

দিচ্ছি, আমার বেহালা বাজনার সামনে তোমরা দাঁড়াতে পারবে না। পাড়াগাঁ থেকে আসছ মনে হচ্ছে। কি বাজাবে, একতারা? এখানে কল্‌কে পাবে না ভায়া।

সুরদাস মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, এই একটু পাড়াগাঁয়ের গান গাইব। পয়সা, আনি, দোয়ানি ত কেউ দেবে?

বেহালাবাদক বললে, দেখ, দেখ, ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ। তারপর নিজেই সরে পড়তে পথ পাবে না।

সুরদাস নিজের গামছাটাকে ঠিক করে পেতে নিলে। চিত্রককে বললে; এইখানে আমার পাশে এসে বোস।

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে সুরদাস গান ধরলে :

"পথের পথিক করেছ আমারে
সেই ভালো ওগো সেই ভালো।'

মুহূর্তের মধ্যে সেই কোলাহল মুখরিত জায়গা যেন সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে এক স্বপনপুরীতে পরিণত হল।

শুধু সুর আর গান, মিল আর ছন্দ, উঁচু আর নীচু পরদা।

যে ভদ্রলোক বাজার করে তড়িঘড়ি বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিয়েছিল সে থলে হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

যে কুলি তার ঝাঁকাটা নিয়ে ছুটে চলছিল সে যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

যে মহিলাটি পূজোর ফুল কিনে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

যে বুড়ো ভদ্রলোক তার জিনিসের দাম নিয়ে উঁচু গলায় এতক্ষণ ঝগড়া করছিলেন তিনি হঠাৎ কান পেতে রইলেন :

যে ছেলের দল হল্লা করতে করতে রাস্তা পার হচ্ছিল তারাও যেন কিসের টানে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুরদাসের কণ্ঠে গান যেন কোকিলদল বাসা বেঁধেছিল। ওর গান শুনতে বহু মানুষ এসে ভিড় করল।

রাস্তার অপর ঠেলা গাড়ি, ট্যাক্সি,বাড়ির গাড়ি, ফিটন গাড়ি রাস্তা বন্ধ করে এক দারুণ অবস্থার সৃষ্টি করল।

ওদিকে সুরদাসের গামছার ওপর ঠন্ ঠন্ শব্দে পয়সা পড়তে লাগল। পয়সা ডবল পয়সা, আনি, দোয়ানি, এমন কি সিকি, আছুলি টাকা পর্যন্ত।

এ যেন এক জাদুকরের ইন্দ্রজালের খেলা।

বেহালাবাদক এই জাদুর খেলা দেখে তার বেহালা নিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়ল।

চিত্রক পয়সাগুলো হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিতে নিতে কইলে, সুরদাস, আমি তোমার যে গানকে চিরকাল হেনস্থা করেছি, তাই আজ শহরের রাজপথে তোমার গলায় জয়ের মালা পরিয়ে দিলে। তোমার এই গানই আমাদের অনাহার থেকে বাঁচবে।

সুরদাস ফিস্‌ফিস্ করে কইলে, চুপ করে বসে থাকো ত! এখন থেকেই পয়সা জমাতে হবে। তোমার চোখের চিকিৎসা করাতে হবে না? আসল কাজটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে কি?

প্রথম দিনেই বেশ টাকাকড়ি পেয়ে গেল সুরদাস।

বন্ধুকে নিয়ে একটি কাছের হোটেলে গিয়ে হাজির হল। হোটেলে কর্তাকে বললে, আমরা দুই বন্ধু দুইবেলা করে এখানে খেয়ে যাবো। হিসেব মতো নগদ পয়সা মিটিয়ে দেবো।

হোটেলের ম্যানেজার কইলে, ঠিক আছে। নগদ পয়সা দিয়ে যখন খাবে, তখন আর আপত্তি করবার কি আছে। আজ থেকেই শুরু করে দাও।

সেই দিন থেকেই খাওয়া-দাওয়ার একটা পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সুরদাসের গান শোনার জন্য লোকের ভিড় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। আর সেই হিসেবে আমদানীও হতে লাগল ভালো।

সুরদাস একটা টিনের কৌটো করে নিয়েছে। সারাদিনের সংগ্রহ করা টাকাপয়সা সে এই কৌটোর ভেতরই জমা করে রাখে।

ধীরে ধীরে কিছু বিছানাপত্রও কিনে নিয়েছে ওরা।

সেগুলি সেই পোলের তলায় লোহার পাইপের ভেতরেই রেখে আসে। ওখানে কে আর উঁকি দিতে যাবে ?

সবাই মনে করবে—ভিখারী দুটো ছোঁড়া এখানে থাকে ? তাই নিরাপত্তার জন্য ওরা নতুন করে আর কিছু ভাবেনি !

একদিন দুই বন্ধু একটু বেশী রাত্রে হোটেল থেকে খেয়ে ফিরে এলো নিজেদের ডেরায়।

সেখানে ছেঁড়া কাঁথা আর শতসঞ্চির তলায় লুকানো ছিল সেই "যখের ধন", ওদের বহু কষ্টের সঞ্চিত ভাণ্ডার টিনের কৌটো। কিন্তু সেই অন্ধকারে আঁতিপাতি করে খুঁজেও ওরা সেই টিনের কৌটো খুঁজে পেলো না। পাইপের আঁধারেও চোর আসে ?

সুরদাস বললে, বন্ধু দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। ভগবানই দিয়েছিলেন, আবার তিনি ফিরিয়ে নিলেন।

দুটো দিন সুরদাস আর চিত্রক মনমরা হয়ে রইল।

চিত্রক একটা দীর্ঘনিঃশ্বার ছেড়ে বললে, বন্ধু, তুই বৃথাই চেষ্টা করছিস। আমার চোখ আর ভালো হবে না। এই শহরে দুবেলা খেয়ে বেঁচে থাকাই দুর্ঘটনা। আবার তার ওপর চোখে চিকিৎসা। যাকে বলে একেবারে আকাশের চাঁদ পেড়ে আনবার পরিকল্পনা।

সুরদাস মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, শোন, তোকে বলি চিত্রক, ভগবান এতক্ষণ অকরুণ হবেন না। আত্মীয়-স্বজন, মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়েছেন বাড়ি ভেঙে দিয়েছেন, পথের ভিখারী করেছেন। তার ওপর চোখ দুটিও কি কেড়ে নেবেন ? এত অকরুণ তিনি নন। একদিক দিয়ে তিনি শাসন করেন, অন্য দিক দিয়ে দু হাত ভরে দেন। দেখিস, আমাদের সুদিন আসবে। আমার মন বলছে, তার আর বেশী বিলম্ব নেই।

নতুন উদ্যমে সুরদাস আবার গান গাইতে শুরু করল। সুরদাসের গানের শ্রোতার সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল। এমন কি বাজারের দোকানদাররা অবধি এসে গান শুনে ওকে ফল, মিষ্টি সব আপনা থেকেই দিয়ে যেতো।

সবাই বলাবলি করত, আহা। গান শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। একদিন সন্ধ্যের দিকে সুরদাসের গান খুব জমে উঠেছে।

অফিস ফেরত বাবুরাও খানিকক্ষন দাঁড়িয়ে গান শুনে যাচ্ছে। এমন সময় খ্যাচাং করে একটি মোটর এসে সুরদাসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

স্যুট-বুটে সজ্জিত এক শৌখিন সুপুরুষ ব্যক্তি, তার সঙ্গে এক অপরূপ সুন্দরী মহিলা গাড়ী থেকে নেমে সেই ফুটপাতেএসে দাঁড়ালেন।

দুইজনে খানিকক্ষণ ওর গান শুনলেন। সেই ভদ্রলোক তারপর হঠাৎ সুরদাসের হাতে একটি দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে কইলেন রহে, দিব্যি মিষ্টি গলা তো তোমার। সিনেমায় নামবে? যদি রাজী থাকো ত বল। গান গেয়ে অনেক টাকা পাবে সেখানে।

সুরদাস মাথা নীচু করে কইলে, বাবু হুকুম করলেই গাইব। ভদ্রলোক একটি কার্ড ও হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, কাল সকাল দশটায় এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো। গাড়ী ভোঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

*

* *

সিনেমার পরিচালক সুরদাসকে আদর করে কাছে বসালেন।

বললেন, তোমার গান শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমরা একটা নতুন ধরনের সিনেমা করছি। তার বিষয়টি হচ্ছে,—একটি গ্রামের ছেলে গান গেয়ে ভাটির টানে নৌকো বাইত। কিভাবে তার লোক সঙ্গীতে সারাদেশে মেতে উঠল, আর সে যখন বহু টাকা রোজগার করে শহরে এসে বাড়ী তৈরী করে, গাড়ী কিনে বিলাসের মধ্যে বাস করতে থাকল, তখন সে রাত্রে ঘুমুতে পারত না। নদী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত। শহরের কোলাহলে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তখন সে সব কিছু দেড়ে আবার গ্রামে ফিরে গেল। নৌকো বেয়ে গান গাইতে লাগলো। নদীর কলতান তাকে আপন করে ডেকে নিল। আবার নতুন করে তার চোখে ঘুম এলো। সে নৌকোর পাটাতনে ওপর শুয়ে এতদিন পর ঘুমিয়ে পড়ল।

এই পার্টটা তোমায় সিনেমায় অভিনয় করতে হবে। পল্লী অঞ্চলে বহু গান, আর ভাটিয়ালী সুরের গান এই সিনেমায় থাকবে। অবশ্য আমরাই তোমাকে সব শিখিয়ে নেবো। এখন তুমি খোলা মনে বলো, সিনেমায় অভিনয় করবে কিনা ?

সুরদাস পরিচালককে বিনয়ের সঙ্গে বললে, আমি আপনার কথা মত সব কিছু করতে রাজি আছি কিন্তু আমার এক বন্ধু হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেছে। তার চিকিৎসা করাতে হবে। আপনি আমাকে কিছু টাকা-কড়ি দেবেন বলেছিলেন—

পরিচালক মশাই উৎসাহিত হয়ে তার পিঠে চাপড়ে দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! টাকাকড়ি তোমায় দেব বৈকি! এই সিনেমায় অভিনয় করার জন্য সিনেমা কোম্পানি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দেবে। তবে তোমায় ছ'মাস ধরে অনেক পরিশ্রম করতে হবে

সুরদাস অবাক হয়ে বললে, আপনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন? হু! এতে আমার বন্ধুর চিকিৎসা বেশ ভালো ভাবেই হয়ে যাবে। আপনার কথায় আমি রাজী।

পরিচালক মানুষটি ভালো। এক কথার লোক। তিনি বললেন, আমি বহু ছেলেকে দিয়ে এই ভূমিকার অভিনয় করাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ আমার মনের মতো অভিনয় করতে পারেনি। আমি বুঝেছি—তুমি নিশ্চয়ই পারবে।

সেই দিনই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা হয়ে গেল। পরিচালক প্রথমে ওকে এক হাজার টাকা দিয়ে দিলেন।

বললেন, এটা তোমায় আগাম দিলাম। পরে মাঝে মাঝে দেবো। সব টাকাই পেয়ে যাবে।

মহাআনন্দের সঙ্গে সুরদাস তাদের সেই পাইপের ঘরে ফিরে এলো। ওর বন্ধু চিত্রক পথের দিকে চেয়ে বসে ছিল।

বন্ধুর কাছে সব কথা শুনে চিত্রক ভারী খুশী হল সুরদাস হাসতে বললে, এখন নগদ এক হাজার টাকা পেয়েছি। কাল থেকেই তোমার চোখের চিকিৎসা শুরু হতে পারবে।

চিত্রক তার বন্ধুর কথায় প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল না-না সেটা একটা কাজের কথাই নয়। তুমি প্রাণপাত পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করবে, আর আমার চোখের চিকিৎসার জন্যে ফতুর হয়ে যাবে —এটা হতেই পারে না। তুমি এখন থেকেই টাকা জমাতে থাকো। সামনে তোমার ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। এই শহরে চলতে গেলে প্রতি পায়ে টাকার দরকার। সেটা কি এখনো বুঝতে পার নি ?

চিত্রকের কথা শুনে সুরদাস হাসতে থাকে। সে বললে, শহরের পথে চলতে গেলে টাকার নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু সবার আগে যে কাজটার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তোমার চোখের চিকিৎসা। আর সব কিছু পরে করলেও চলবে। কিন্তু চোখ কারো জন্যে বসে থাকবে না। তোমার চোখের দৃষ্টি ফিরে এলে তুমিও নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে। এই যে তুমি ছবি আঁকতে, এই দুর্ঘটনার জন্যে তুমি আর ছবি আঁকতে পারছ না। তোমার জীবনের আসল কাজ বন্ধ হয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি যদি তুমি ফিরে পাও, আবার নতুন করে রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে আরম্ভ করতে পারবে। তখন তুমি কত টাকা আয় করবে তা তুমি নিজেই জানো না। কাজেই আমি তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি —আসছে কাল সকালবেলা তুমি আমার সঙ্গে চোখের ডাক্তারের কাছে যাবে। আর একদিনও দেরি না করে চোখের চিকিৎসা শুরু করা দরকার—

চিত্রক আমতা আমতা করে কইলে, কিন্তু তোমার এতগুলি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

সুরদাস ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে বললে, বেশ ত! তুমি যদি মনে করো তোমার চিকিৎসার জন্যে আমার টাকা খরচ হচ্ছে তা হলে এই টাকা তুমি ধার হিসাবে নাও। তোমার চোখ ভালো হলে আবার যখন তুমি। দেখতে পারবে, প্রচুর ছবি এঁকে বিক্রী করতে পারবে, তখন আমার টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব করে শোধ দিয়ে দিতে পারবে। এতে ত তোমার কোন আপত্তি নেই ?

এই করার পর চিত্রক আর কোন আপত্তি করতে পারল না।

সে বেশ বুঝতে পেরেছিল, সুরদাস ওর চোখের চিকিৎসা করাবেই; কোন ওজর আপত্তি শুনবে না।

চিত্রক মনে মনে স্থির করল, তবে তাই হোক। এখন সুরদাসের টাকাতেই তার চোখের চিকিৎসা চলুক। তারপর ভগবান যদি মুখ তুলে চান ওর চোখ যদি ভালো হয়ে যায়, তা হলে ছবি এঁকে সে তার ঋণ পরিশোধ করবে।

পরদিন সুরদাস চিত্রককে নিয়ে এক চোখের ডাক্তারের কাছে হাজির হল।

ওখানে নানারকম রোগীর খুব ভিড়। ওদের দু'জনকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল।

তারপর চিত্রকের পালা যখন এলো, ডাক্তারবাবু খুব যত্ন করে, নানা রকম আলো ফেলে তার চোখে দুটি পরীক্ষা করে দেখলেন।

অবশেষে তিনি মন্তব্য করলেন, হঠাৎ চোখে লেগে চোখের এই দশা হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে চিকিৎসা করলে চোখের জ্যোতি ফিরে আশার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুরদাস ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ জানিয়ে কইলে, ডাক্তারবাবু, আপনি আমার বন্ধুর চোখ দুটি ভালো করে দিন। টাকার জন্যে আপনি ভাববেন না। আমি আপনার ফি আর ওষুধের দাম ঠিক জুগিয়ে যাবো। ওর চোখ দুটো আপনি ভালো করে দিয়।

ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন, আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। এই অল্প বয়েসে চোখ হারানো যে কী ব্যাথা সেটা আমি বেশ বুঝতে পারি। চোখের দৃষ্টি ফিরে না এলে ওর সারা জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সেদিন থেকেই ডাক্তারবাবু চিত্রকের চোখের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

সুরদাস ডাক্তারের ফি আর ওষুধের দাম গুনে দিয়ে এলো।

চিত্রক মনে-মনে তখন নিজের মৃত্যু কামনা করছিল। এই সুরদাসকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। ওকে তার প্রধান শত্রু বলে মনে করত। ওর মুখের দিকে চাইলে তার ঘৃণা হত আজ সেই সুরদাস তার

চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে আনবার জন্য নিজের কষ্টের উপার্জন দু'হাতে খরচ করছে।

এইসব নানা কথা চিত্রকের মনে জেগেছিল। আর বিবেকের দংশনে সে কেবলি অনুতাপ করছিল।

ওদিকে ষ্টুডিওতে সুরদাসের কাজ খুব বেড়ে গেছে। পাঁচ হাজার টাকা যেমন দেবে, তেমনি ওকে খাটিয়েও নিচ্ছে প্রচুর।

গানের শিক্ষকের কাছে নানা ঢঙের গান শিখতে হচ্ছে। যন্ত্র যারা বাজায়, সেইসব যন্ত্রবিদ্‌দের সঙ্গে প্রত্যেকটি গান মহড়া দিতে হচ্ছে।

আবার সারাদিন ধরে স্যুটিং চলছে। ওই উত্তপ্ত কড়া আলোর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সারাদিন ধরে অভিনয় করতে হচ্ছে।

দিনের শেষে তার যখন ছুটি হয়, সে যেন একেবারে আধমরা মানুষ হয়ে যায়। অবশ্য একজন লোক ওকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। ধুঁকতে ধুঁকতে সে যখন নিজের ডেরায় ফেরে আসে, তখন আর কারো সঙ্গে কথা বলবার ক্ষমতা তার থাকে না।

ইতিমধ্যে সেই পুলের তলাকার লোহার পাইপ ছেড়ে একটা মেসে ঘর নিয়েছে। সেইখানেই দুজনে মিলে থাকে। আর খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়।

ইদানীং রোজই সুরদাসের স্যুটিং থাকছে, তাই দুপুরের খাওয়াটা ষ্টুডিও থেকেই পায়।

তখন চিত্রককে মেসে একা একাই স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হয়। আগে একা একা সবকিছু করতে ওর ভারী অসুবিধে হত। এখন রীতিমত অভ্যেস হয়ে গেছে। তা ছাড়া মেসের চাকরও ওকে স্নান করিয়ে দেয়। সে জন্যে সুরদাস ওকে আলাদা টাকা দিয়ে থাকে।

সুরদাস এখন সারাটা দিন এত ব্যস্ত থাকে যে চিত্রকের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সুরদাস খুব সচেতন। সে মেসের এক বাবুকে বিশেষ অনুরোধ করে এই ব্যবস্থা করেছে যে, তিনি চিত্রককে প্রয়োজন মত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন আর ওষুধপত্র এনে দেবেন।

এইভাবে সুরদাসের ব্যস্ত দিনগুলি আকাশের বলাকার মত যেন উড়ে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

সারাদিন কাজের মধ্যে আটকা থাকলে যেমন দারুন পরিশ্রম হয়, আবার কাজেরও একটা মোহময় নেশা আছে। কাজে মেতে থাকলে মনে হয়, আমি সত্যিকারের একটা গড়বার কাজ করে চলেছি। আমি অলস নই, নিষ্কর্মা নই। জগতের লোকের কাছে আমার দেবার আছে। তাতে উৎসাহ জাগে, প্রেরণা জাগে, আর অনেক কাজ করবার জন্য মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

এর মধ্যে আরো একটা ঘটনা ঘটল। ওদের মেসে হঠাৎ এক ভদ্রলোক একটি গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। ভদ্রলোক বললেন, সুরদাস কে? আমি বেতার কেন্দ্র থেকে আসছি, তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সুরদাসকে দেখে তিনি অবাক হয়ে কইলে, তুমি যে একেবারে পুঁচকে ছেলে। আমি তোমার গানের রেকর্ড ষ্টুডিওতে শুনেছি। ভারি মিষ্টি গলা তোমার। রেডিওতে গান গাইবে তুমি? আমি তোমায় নিতে এসেছি। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে গলাটা পরীক্ষা করে দেখা। কিন্তু তোমার গানের গলা এমনিতেই এত মিষ্টি তে আর দেখতে হবে না। আমরা তোমায় অনেকগুলি টেপ করে রাখবো।

সুরদাস একটু কুন্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, গান গাইলে আপনারা আমায় টাকা দেবেন ত? আমার অনেক টাকার দরকার। এক বন্ধুর চোখের চিকিৎসা করাতে হবে।

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, গান গাইলে টাকা তুমি পাবে। বেশ ভালো টাকা তোমায় দেওয়া হবে। আমরা তোমায় অনেকগুলি পল্লীগীতি টেপ করে রাখবো।

সুরদাস উত্তর দিলে, তাহলে চলুন যাই। আজ আমার কোন স্যুটিং নেই, কাজেই ষ্টুডিওতে যেতে হবে না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে সুরদাস বেতার-কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হল। একেবারে ভেতরে গিয়ে তিনি সুরদাসকে একটি ঠাণ্ডা ঘরে বসিয়ে দিলেন। এইখানেই গান গাইতে হবে।

*

* *

যিনি রেকর্ড করবেন তিনি পাশের ঘর থেকে জানিয়ে দিলেন, গান গাওয়ার জন্য তৈরী হয় ভাই। লাল আলো জ্বলে উঠলেই গান শুরু করে দেবে।

এতদূর আসতে সুরদাসের গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল। সে একটু খাটো গলায় কইলে; এক গেলাস জল দিতে পারবেন! আমার গলাটা যেন শুকিয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক একজন বেয়ারাকে ডাকলে। সে এক গেলাস জল এনে দিলে। ঢক্ ঢক্ করে এক গেলাস জল খেয়ে যেন সুরদাস শান্ত হল।

তারপর একটু বাদেই লাল আলোটা জ্বলে উঠল। সুরদাস গান শুরু করলে।

যে গানগুলো সে গাঁয়ের নদীর ধারে বন্ধুদের শোনাতো, সেই পুরোনো ভাটিয়ালী গান। দিব্যি জমে উঠল গান।

একে একে অনেকগুলো গান টেপ-রেকর্ড করে রাখা হল। যিনি ওর সঙ্গে বাঁয়া তবলা বাজাচ্ছিলেন, তিনি উৎসাহে ঘনঘন মাথা নাড়তে লাগলো। আর একজন শিল্পী গানের সঙ্গে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। তাঁর বাজনাও খুব জমে উঠেছিল।

ভাটিয়ালী গান। পুরোনো রাধাকৃষ্ণের প্রেমসঙ্গীত। ভক্তিমূলক গান। প্রাচীন রাগসঙ্গীত আর টপ্পা। পর পর অনেকগুলি গান গেয়ে গেল সুরদাস।

মনে হল গান গান গেয়ে সে বেশ তৃপ্তি লাভ করেছে। এরপর ভদ্রলোক ওকে নিয়ে অফিস ঘরে গেলেন।

সুরদাসের সঙ্গে বেতার-কেন্দ্রের একটি দীর্ঘকালের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা হল।

ভদ্রলোক একটি চেক ওর হাতে তুলে দিলেন। বললেন, তোমার বয়েস কম। এই ত রোজগারের সময়, একটি ভালো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে ফেল। এরপর চেক পেলেই ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারবে।

এর মধ্যে নানা কাগজে ওর সদ্য তোলা সিনেমার নানারকম খবর আর ছবি বেরুতে শুরু করে দিয়েছে। শহরের পথে পথে পোষ্টারও দেখা যাচ্ছে।

সে যে খুব ভালো অভিনয় করেছে আর গান গেয়েছে, সে কথা সিনেমা জগতে চালু হয়ে গেছে।

নানা প্রতিষ্ঠান থেকে লোক আসছে তার কাছে।

বইটির নাম দেয়া হয়েছে—"সুরের মায়া।" অবশেষে শুভ উদ্বোধনের সময় এসে গেল।

সিনেমা প্রতিষ্ঠানে একটি নামকরা চিত্রগৃহে প্রেস-শোর ব্যবস্থা করছে।

অনেক নামকরা মানুষ নিমন্ত্রিত হয়েছেন এই প্রেস-শোতে। রাজ্যপাল ছবিটির উদ্বোধন করেছেন।

এ ছাড়া বহু কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও সঙ্গীতশিল্পীরা আমন্ত্রিত হয়েছেন।

সুরদাসের বুক দুরদুর করছে। ছবি দেখে এইসব জ্ঞানী গুণী মানুষ কি বলবেন, তাই ভেবে রাত্রে ওর ঘুম হচ্ছে না।

চিত্রক দুঃখ করে বললে, তোর এমন সুন্দর ছবিটি সবাই দেখবে, কিন্তু আমি দেখতে পাবো না।

সুরদাস বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে কইলে, নাই বা দেখতে পেলি। আমার গানগুলো ত শুনতে পারবি। আমি তোকে শো-তে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

চিত্রক ওর বন্ধুর গান শুনতে পারবে, অভিনয় উপভোগ করতে পারবে, তাতেই খুশী।

মেসেরও দুই-একজন ওদের সঙ্গে গেল। তাদের উৎসাহও নেহাৎ কম নয়।

ওদের মেসের সুরদাস সিনেমায় নেমেছে, এতে মেসের বোর্ডাররা সবাই মনে মনে গর্ব অনুভব করছে।

রাজ্যপাল একটি বক্তৃতা দিয়ে ছবি উদ্বোধন করলেন। এই প্রেস-

শো উপলক্ষে একটি সুন্দর স্যুভেনিয়া ছাপা হয়েছে। তাই নিমন্ত্রিত সবাইকার হাতে দেয়া হল।

তারপর ঘর অন্ধকার করে দিয়ে শুরু হল সিনেমা—"সুরের মায়া।"

*

* *

প্রথম থেকেই গানে আর প্রাণ মাতানো অভিনয় গল্পটি বেশ জমে গেল। কেউ কেউ শো চলাকালে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, কাঁদতে লাগল। আবার অনেকে আহা-উহু করতে লাগল।

ছবির বিরামের সময় সবাই এসে ওকে ছেঁকে ধরল। রাজ্যপাল পিঠ চাপড়ে ওকে খুব উৎসাহ দিলেন।

প্রবীণ লোকেরা প্রেরণা দিয়ে কইলেন, এইটুকু ছেলে যা গান গেয়েছে—একেবারে অপূর্ব?

বইটি যে হিট্ করবে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না। পরিচালক সবাইকে শোনাতে লাগলেন, আমি ওকে পথ থেকে আবিষ্কার করেছি। কাজেই গর্বটা আমারই বেশী। বিভিন্ন সিনেমা কাগজের সম্পাদকরাও এসে সুরদাসের সঙ্গে নানারকম আলোচনা করতে লাগল।

কোথায় দেশ—কী ভাবে এত সুন্দর গান শিখল,—সিনেমায় অভিনয় করার কথা,—কি ভাবে তার মাথায় এলো,—

অনেকগুলি ক্যামেরাম্যান এসে নানা ভঙ্গীতে সুরদাসের ছবি তুলে নিয়ে গেল।

সুরদাস বললে, আমার বন্ধুরও একটা ছবি তুলুন। ওর নাম চিত্রক। ও খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে। চোখের অসুখটা সেরে গেলেই ও আবার নতুন করে ছবি আঁকতে শুরু করবে।

চিত্রকও বন্ধুর গান আর সুন্দর অভিনয়ের কথা শুনে খুব খুশী হয়ে উঠল।

পরের সপ্তাহে নানা কাগজে ছবি দিয়ে সুরের মায়ার সমালোচনা ছাপা হল।

সারা শহর জুড়ে শুধু সুরের মায়ার কথা।

বেতারেও এই সিনেমার সমালোচনা খুব ফলাও করে প্রচারিত হল। চারিদিকে শুধু প্রশংসা আর সুখ্যাতি—

এত জয়ধ্বনির মধ্যেও কিন্তু সুরদাস বন্ধুর চোখের চিকিৎসার কথা ভোলেনি। একদিন চিত্রককে নিয়ে সেই চোখের চিকিৎসকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

ডাক্তারবাবু, ওর চোখের ত' বিশেষ উন্নতি দেখছি না। আপনি কি আবার ভালো করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন ?

এই কথা সুরদাস চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করলেন।

ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন, আমি ত' প্রায়ই তোমার বন্ধুর চোখ পরীক্ষা করে দেখছি। ওষুধও রীতিমত খাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকারর উপকার বুঝছি না।

একটু থেমে তিনি বললেন, আমার কি মনে হয় জানো ? আরো একজন চক্ষু-বিশেযজ্ঞকে ওর চোখ ভালো করে দেখানো দরকার।

সুরদাস একটু উত্তলা হয়ে উত্তর দিলে, আপনি যা ভালো বুঝবেন, —সেই রকম ব্যবস্থাই করবেন। মোট কথা আমার বন্ধুর চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতেই হবে। আপনি টাকার জন্যে ভাববেন না, সেজন্য আমি সব রকম জায়িত্ব নিচ্ছি।

ডাক্তারবাবু একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, না,—না আমি এখন টাকার কথা ভাবছি না। একটি রোগীর দৃষ্টিশক্তি পাইয়ে দেবার মধ্যে যে আনন্দ লুকিয়ে আছে—আমি শুধু তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি ! চিকিৎসকও ত' চায় রোগী ভালো হোক,—আর তারনাম-যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

সুরদাস বললে, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন ডাক্তারবাবু। প্রথম দিন থেকেই ত' আমার বন্ধুর চিকিৎসার দায়িত্ব আপনার হাতে তুলে দিয়েছি। আপনি এ সম্পর্কে যা ভালো বুঝবেন—তাই হবে।

সুতরাং চিত্রকের চিকিৎসা নতুন করে শুরু হল। অভিজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসকের অভিমত নিয়ে তাকে সমীক্ষার জন্যে একটি নামকরা হাসপাতালে ভর্তি করা হল। তাঁরা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে নানাভাবে চিত্রকের চক্ষুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সুরদাস প্রত্যহ ষ্টুডিওর কাজ সমাধা করে হাসপাতালে চলে আসত। সেখানে ভিজিটীং আওয়ারে তার বন্ধুকে দেখে আর তাকে উৎসাহ দিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে আসত।

ইতিমধ্যে সুরের মায়ার সাফল্যে সুরদাস আরো নতুন কয়েকটি ছবির কাজ পেয়েছে! তার পারিশ্রমিকের হারও অনেক বেড়ে গেছে।

ইতিমধ্যে একদিন রেকর্ড কোম্পানি থেকে প্রতিনিধি এসে হাজির!

সুরের মায়ার সাফল্য গ্রামোফোন কোম্পানি ঠিক করেছে—সুরের মায়ার নাটক ও গানগুলিকে ভিত্তি করে তারা একটি পালা রেকর্ড তৈরী করবে। এ জন্যে সুরদাস অনেক টাকা পাবে।

সেই ব্যাপারে পাকা কথা বলতেই গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতিনিথি সুরদাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

সুরদাস উত্তর দিলে, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে সুরের মায়ার কপি রাইট নির্মাতা সিনেমা কোম্পানির। আগে সেই প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিতে হবে।

গ্রামোফোন কোম্পানির প্রতিনিধি জানালেন যে, তারা আগেই সিনেমা কোম্পারি সম্মতি পেয়েছেন। এইবার সুরদাস যদি অভিনয় করতে রাজী থাকে—তাহলে দশটি রেকর্ড এই পালা গান তোলা হবে। সে জন্যে রেকর্ড কোম্পানি থেকে টাকা এবং রয়েলটি এই দুই ব্যবস্থাতেই সম্মত আছে কিছু।

সুরদাস থেকে টাকাটাই পছন্দ করল!

কেন না—বন্ধু চক্ষুর চিকিৎসার জন্য এখন সব সময় নগদ টাকারই প্রয়োজন। সেই ভাবের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে পালা-রেকর্ড তৈরী হয়ে বাজারে বের হল!

সব কাগজেই অভিমত সহ বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপা হল। এই পালা রেকর্ডও খুব সুনাম অর্জন করল।

এই পালা রেকর্ড সর্বত্রই শোনা যেতে লাগল। বিভিন্ন রেকর্ডের দোকানে, সিনেমা হাউসগুলিতে, বেতারে আর সভা-সমিতি সম্মেলনে।

ছোট বড় সকলের মুখেই সুরদাসের গানগুলি শোনা যেতে লাগল।

একদিন সুরের মায়ায় প্রডিউসার এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করে কিশোর গায়ক সুরদাসের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করল। সুরদাসকে স্বর্ণপদক আর নগদ টাকাও দেওয়া হল। সুরদাসের গানের নামে এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতাওর ব্যবস্থা করা হল। তাতে বহু ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে যোগদান করল।

শহরের চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল। সবাই সুরদাসকে দেখতে চায়। কী উত্তেজনা!

*

* *

সুরদাস কিন্তু নিজের দায়িত্বের কথা ভোলেনি।

কি করে চিত্রকের চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে আনা যায়—সে বিষয়ে সে দিনরাত চিন্তা করছে।

এখন আর সুরদাসের অর্থের অভাব নেই। মা লক্ষ্মীর কৃপায় চারদিক থেকে তার ভাণ্ডার পুর্ণ হচ্ছে। সিনেমা থেকেও অনেক টাকা পাচ্ছে। প্রায়ই তাকে সেখানে নানা ধরনের লোক সঙ্গীত গাইতে হয়। গ্রামোফোন কোম্পানিতে ওর যে 'সুরের মায়া' পালা রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে তার চাহিদা দিনের পর দিন কেবলি বেড়ে যাচ্ছে। রয়ালটি হিসাবে সেখান থেকেও বেশ টাকাকড়িপাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া শহরে নানা সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্মেলন হয়ে থাকে মোটা পারিশ্রমিক সেই সব অনুষ্ঠান থেকে ডাক আসে। কাজেই বেশ অল্প দিনের মধ্যেই সুয়দাস অনেক টাকা জমিয়ে ফেলেছে।

বালিগঞ্জ অঞ্চলে জমি দেখা হচ্ছে। সেখানে ছোট-খাটো বাড়ি তৈরি হবে। দুই বন্ধু সেখানে এক সঙ্গে থাকবে—এই পরিকল্পনা।

একদিন গভীর রাত্রে সুরদাসের ঘুম ভেঙে গেল। সে কান পেতে শুনল, কে যেন চাপা গলায় আর্তনাদ করছে। সে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠল।

কে এমন করে গভীর রাত্রে কাঁদে। আলো জ্বালিয়ে দেখলে,

চোখের ওপর হাত রেখে চিত্রক অনেক কষ্টে তার ব্যাথাকে চেপে চেষ্টা করছে।

তাই ত! চিত্রকের চোখের অসুখটা কি আবার বেড়ে গেল? সুরদাস চিত্রকের বিছানার পাশে গিয়ে বসল। তারপর ওর হাতখানি টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে চিত্রক? চোখের ব্যথাটা কি আবার বেড়েছে?

চিত্রক উত্তর দিলে, তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে আমার সত্যি দুঃখিত। সারাদিন ধরে তোমার খাটা-খাটুনি চলে—তারপর রাত্রিতেও যদি ঘুমুতে না পারো তাহলে যে তোমার শরীরই খুব খারাপ হয়ে যাবে।

সুরদাস হেসে বললে, কাজের মধ্যে থাকলে শরীর কখনো খারাপ হয় না। আর সে চিন্তা পরে করলেও চলবে। আপাততঃ তোমায় মেডিক্যাল কলেজের একটি কেবিনে ভরতি করে দিতে হবে। চোখের ব্যাপার নিয়ে আর হেলাফেরা করা মোটেই চলবে না।

পরদিন খুব ভোরে উঠেই সুরদাস তার প্রথম নিযুক্ত ডাক্তারের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করল। তারপর চিত্রককে যাতে মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিকিৎসা বিভাগে অবিলম্বে ভর্ভি করা চলে তার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করতে বলল।

আগেকা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশেষ কিছু ত্রুটি পাওয়া যায় নি। তাই চিত্রককে বাড়িতে ফিরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে চোখের ক্ষতি হচ্ছে—সেটা সুরদাস এখন বেশ বুঝতে পারল। আর কোনো মতেই অপেক্ষা করা চলে না। সেই দিনই একটি কেবিন ভাড়া করে চিত্রককে মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু-চিকিৎসা বিভাগে স্থানান্তরিত করা হল।

এবার সুরদাস সবরকম পরীক্ষার জন্য নির্দেশ দিল। এখন আর অর্থের অভাব নেই। সুতরাং নামকরা সকল চক্ষু-চিকিৎসকেই সে নিযুক্ত করতে পারবে।

সাতদিন ধরে যন্ত্রের সাহায্যে সব রকম পরীক্ষাই চালিয়ে যাওয়াহল।

অবশেষে প্রবীন চক্ষু চিকিৎসকবৃন্দ বহু আলোচনা করে জানালেন

চিত্রকের চোখের সূক্ষ্ম শিরাগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। আগে সেটা যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়েনি। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে।

এর সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে দুই চোখের অপারেশন করা।

কিন্তু অপারেশন করলেই যে চোখের দৃষ্টি ফিরে আসবে সে কথা চক্ষু-চিকিৎসকরা জোর দিয়ে বলতে পারছেন না। তবে তারা চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে আনতে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন, এ কথা সুরদাসকে জানালেন।

সুরদাস কিছুতেই মনস্থিত করতে পারছে না। তখন সে তার বন্ধুর মতামত জিজ্ঞেস করল।

হতাশের সুরে চিত্রক উত্তর দিল, আর আমার চোখ ভালো হবে না। মিছিমিছি বহু টাকা খরচ করে অপারেশন করে কি লাভ? তার চাইতে যেমন আছে তেমনি চলুক—

সুরদাস প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন, সে কথার কোন মানে হয় না। এটা বিজ্ঞাপনের যুগ। মানুষ বিজ্ঞানের বলে চন্দ্রে চলে যাচ্ছে—আর চোখের দৃষ্টি ফিরে আসবে না? যদি প্রয়োজন হয়, তা হলে বহু টাকা ব্যয় করে কারো চোখের রেটিনা কিনে নেয়া হবে। তারপর সেই চোখ চিত্রকের দুই নয়নে সন্নিবেশ করা হবে। চিত্রক আবার আগের মত দেখতে পাবে।

প্রবীণ চক্ষু-চিকিৎসকগণ পরামর্শ করে স্থির করলেন,—সেটা এবং সম্ভবপর।

তখন সুরদাস শহরের সব কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে যে, নিজের ইচ্ছায় তার চোখ বিক্রী করবে? এক তরুণের জন্যে দুইটী নয়নের বিশেষ প্রয়োজন। ক্রেতা প্রচুর অর্থ প্রদান করতে সম্মত আছেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় শিল্পী সুরদাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

এই আবেদনের ফলে বহু চিঠি আসতে লাগল। অনেকের ধারণা স্যুটিং করতে গিয়ে সুরদাসের চোখই বুঝি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই দুটি চোখের প্রয়োজন।

একদিন একটি তরুণ কিশোর এসে সুরদাসের সঙ্গে দেখা করল।

সুরদাস তাকিয়ে দেখল, কিশোরের বয়সে তাদেরই যত। সুন্দর চেহারা কাকচক্ষু সরোবরের মত টবটলে দুটি চোখ।

সুরদাস জিজ্ঞেস করলে, তুমি কোন দুঃখে এই বয়সে তোমার চোখ দুটি বিক্রী করবে? সারাটা জীবন তোমায় অন্ধ হয়ে থাকতে হবে।

সেই কিশোরের চোখ দুটি ছলছল করে এলো।

সে মৃদু কণ্ঠে কইলে, আমার মায়ের ক্যানসার হয়েছে। তাঁর চিকিৎসার জন্যে অনেক টাকার দরকার। আপনার বিজ্ঞাপন দেখে বুঝতে পারলাম, চক্ষু দুটির জন্যে আপনি বহু অর্থ ব্যয় করতে রাজি আছেন। তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমার এই দুটি চোখের জন্য আপনি কত টাকা দিতে প্রস্তুত বলুন। মায়ের কষ্ট আর আমি সহ্য করতে পারছি না। তাই আমি তাকে লুকিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

এই কিশোরের মাতৃভক্তি দেখে সুরদাস একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল।

সে কিশোরকে জড়িয়ে ধরে বললে, তুমি তোমার মাকে এত ভালোবাসো। নিজের মা নেই কিনা—তাই মাতৃস্নেহ কি ছেলেবেলা থেকে তা জানতে পারি নি।

—শোনো ভাই, তোমায় একটা কথা বলি! তোমার চোখ তোমারই থাক। তোমাকে ওই চোখ বিক্রী করতে হবে না। তোমার মার চিকিৎসার সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কত টাকা লাগবে ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করে আমায় জানিও। আমি একটি চেক কেটে দেবো।

কিশোর অবাক হয়ে সুরদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সুরদাস হঠাৎ বলে বসল, একটি মাত্র সর্তে আমি তোমাকে টাকা দেবো—

কিশোর জিজ্ঞেস করল, কি সর্ত?

সুরদাস হাসতে হাসতে উত্তর দিল, তোমার মাকে আমি ভাগ করে নেবো। আজ থেকে তোমারও মা আমারও মা হবে। কেমন, এই শর্তে তুমি রাজি?

কিশোর এই কথার কোনো জবাব দিতে পারল না। তার বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে লাগল।

তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে সে সুরদাসের পায়ের ধুলো নিতে গেল। সুরদাস এগিয়ে গিয়ে সেই কিশোরকে বুকে চেপে ধরল।

সুরদাস তক্ষুনি কিশোরের সঙ্গে গিয়ে তার নতুন মাকে দেখতে এলো।

তারপর ক্যানসার হাসপাতালে গিয়ে তার মায়ের চিকিৎসার সব কিছু ব্যবস্থা করে এল। বিকালের দিকে তাদের মাকে অ্যাম্বুলেন্স করে ক্যানসার হাসপাতালে নিয়ে গেল

সেদিন সুরদাসের কেবলি মনে হতে লাগল, তার এত টাকা উপার্জন এতদিনে সার্থক হল। যার ছেলের মন এত উদার, তার মা হয়ত সমুদ্রের স্নেহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে।

সুরদাস চিরকাল স্নেহের কাঙাল।

আজ মাকে পেয়ে তার জীবন ধন্য হল। মা ওকে তৃষিত বক্ষের মাঝ জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, এত দিনে আমার একটি কাঙাল ছেলে ছিল, আজ আমি রাজা ছেলে কুড়িয়ে পেলাম। এ মানিক আমি ভাঙা ঘরে লুকিয়ে রাখতে পারবো?

ইতিমধ্যে সুরদাস আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝখানে বসিয়ে ওদের হবে তিন ছেলের সংসার। বাড়ীর যে প্ল্যান করেছিল—তাও মনে মনে অদল-বদল করেছে। সুরদাস চিত্রক আর শোভন।

এখন থেকে মাকে তিন ছেলের আবদার সহ্য করতে হবে। সুরদাস যেন কাজে নতুন করে উৎসাহ পাচ্ছে।

ওদিকে সেব বিজ্ঞাপন দেখে রাশি রাশি লোক চিঠি লিখেছে।

অনেকে তার সঙ্গে দেখাও করছে!

একদিন একটি অল্পবয়েসী মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে উপস্থিত বললে, আমি আমার চোখ বিক্রী করতে চাই। আপনি আমার চোখ নিয়ে আমাকে অনেক টাকা দিন।

সুরদাস জিজ্ঞেস করে, অনেক টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?

মেয়েটা বললে, আমার স্বামী কিব্যবসা করবে। তার জন্যে টাকার দরকার। ধীরে ধীরে আমার সব গহনা বিক্রী করেছে। আরো নাকি

টাকা চাই। রোজ আমাকে মারধোর করছে। তাই মরিয়া হয়ে আমি চোখ বিক্রি করতে এসেছি।

সুরদাস হেসে বললে, দেখ, একটা কথা বলি। তোমার স্বামীর ব্যবসা-ট্যাবসার কথা সব ভাঁওতা। তোমার সব গয়নামদের দোকানে খরচা হয়ে গেছে। কিন্তু নেশা কাটেনি। তাই আরো টাকা চাই। তুমি ওর নেশা ছাড়াতে পারবে? মাঝখান থেকে চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে থাকবে কেন? আমি তোমার চোখ নেবো না।

ইতিমধ্যে একটা চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেল।

ভিয়েনার চক্ষু চিকিৎসক এই শহরে আসছেন। যদি অদ্ভুত কোনো কেস পান তাহলে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করবেন। মাত্র এক সপ্তাহ তিনি এই শহরে থাকবেন।

সংবাদটা শুনেই সুরদাস মনে মনে স্থির করল—ভিয়েনার এই অভিজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তারপর নিজের আন্তরিক প্রচেষ্টা আর চিত্রকের ভাগ্য। বিধাতাপুরুষ কি চিরকাল মুখ ফিরিয়ে থাকবেন?

*

* *

হাজার কাজের মধ্যেও সুরদাস খবর নিতে লাগল—কবে কোথায় সেই ভিয়েনার চক্ষু-চিকিৎসক এই শহরে এসে পৌঁছাবেন।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল, সেই চক্ষু-চিকিৎসক শহরে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং সেরা হোটেলে অবস্থান করেছেন। তাঁর দেখা মেলা নাকি ভার।

আরো জানা গেল যে, এই বিদেশী চক্ষু-চিকিৎসক মাত্র সাত দিন এখানে থাকবেন, তারপর জাপানের পথে পাড়ি জমাবেন।

সুরদাস সঙ্গে সঙ্গে লোক নিযুক্ত করল, তাঁর সব কিছু খবর জানবার জন্য।

কোথায় কোথায় তিনি এনগেজমেণ্ট করছেন, সেই খবর জানবার জন্য তাঁর পারিবারিক চিকিৎসককে অনুরোধ করলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবার কথাও বলে দিলেন।

এই বিদেশী ভদ্রলোককে কিছুতেই ধরা যায় না।

তিনি সবাইকার কাছে গোপন করে নদীপথে শহরটি দেখে বেড়াচ্ছেন। নানা রকম দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করছেন। আর গভীর রাত্রে সেই হোটেলে ঘুমিয়ে থাকছেন। কাউকে তিনি সহসা ধরাছোঁয়া দিচ্ছেন না।

এই শহরের সাংবাদিক দল তাঁর পেছনে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই তাঁর হদিস পাচ্ছেন না। ফটোগ্রাফারের দল তাঁর ছবি তুলতে গিয়ে হয়রান হয়ে ফিরে আসছেন। ভদ্রলোক কখন যে কোথায় থাকেন তা কেউ বলতে পারে না। এই যে গোপনে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন, সেজন্যে কোনো গাইডেরও সাহায্য গ্রহণ করেন নি তিনি। নানা অঞ্চলে লোক লাগিয়েও সুরদাস কোনো হদিস করতে পারে নি।

অবশেষে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক একদিন খবরটা এনেদিলেন একটি কিশোরের চোখ দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গেছে শুনে তিনি নরম হয়েছেন, আর ছেলেটিকে দেখতে সম্মত হয়েছেন।

এই খবরে সুরদাস যেন আকাশের চাঁদ নিজের হাতের মুঠোয় ভেতর খুঁজে পেল।

খুব গোপনে মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু চিকিৎসা বিভাগে তিনি এই কিশোর ছেলেটিকে পরীক্ষা করে দেখবেন। তারপর যদি সম্ভব হয় তবে অপারেশনের ব্যবস্থা করবেন।

সুরদাস সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডাক্তারের সাথে ব্যবস্থা করে চিত্রককে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে হাজির করলে।

এই রোগী ত মেডিক্যাল কলেজের পূর্ব-পরিচিত। এর সম্পর্কে স্থানীয় প্রবীণ চিকিৎসকবৃন্দও কম আগ্রহশীল নন।

সুতরাং তড়িঘড়ি দেখানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বিদেশী চক্ষু-চিকিৎসক বহুক্ষণ ধরে চিত্রককে পরীক্ষা করলেন। তারপর মন্তব্য প্রকাশ করলেন এটি একটি স্পেশাল কেস। অপারেশনের ফলে চোখ যদি ভালো না হয় তবে চিরতরে ছেলেটি অন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু রোগীর অপারেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে বণ্ডে লিখে দেবে কে? ছেলেটির মা-বাবা কোথায়? তাদের সম্মতি একান্তভাবে প্রয়োজন।

পারিবারিক ডাক্তার জানালেন, রোগীর তিন কুলে কেউ বেঁচে নেই। সবাই ভূমিকম্পের দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ছেলেটির বন্ধু শিল্পী সুরদাসই তার চিকিৎসার সব খরচ চালাচ্ছে। অনুমতি যদি দিতে হয় তবে তাকেই দিতে হবে।

বিদেশী ডাক্তার সুরদাসকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু মুখ বাঁকা করে উত্তর দিলেন, এও ত মাইনর বয়। সে বণ্ডে সই করে দিল কি করে হবে।

সেই বিদেশী প্রবীন ডাক্তার অপারেশন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন।

তারপর এক ফাঁকে কাউকে না জানিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন।

সুরদাস ভাবলে, হাতের কাছে সুযোগ এসে আবার দূরে চলে যাবে?

যে করেই হোক, এই সাহেব কে রাজি করাতে হবে।

চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দিল সুরদাস। যে করেই হোক এই বিদেশী চিকিৎসককের মন নরম করতে হবে।

সাফল্য হাতের কাছে এসে ফিরে যাবে? সুরদাস নতুন করে মন বাঁধলে।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" আবার সব কাজ ফেলে দিয়ে সুরদাস বিদেশী ডাক্তারের হদিসের জন্য চারিদিকে লোক পাঠালে।

কিন্তু কেউ সঠিক খবর জানতে পারল না।

সবাই ভগ্নদূতের মতো ফিরে ফিরে এলো। সুরদাস একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল।

তবে কি বন্ধুর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হবেন না?

বিধাতা কি এত অকরুণ হবেন?

সুরদাস কিন্তু মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, অমঙ্গলের মাঝখানে থেকেই মঙ্গল-প্রদীপটি জ্বলে ওঠে।

না, কিছুতেই হতাশ হলে চলবে না। আবার সে নতুন উদ্যম চারদিকে লোক পাঠাতে লাগল।

গভীর রাত্রে একটি লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো।

—সেই বিদেশী ডাক্তারের সন্ধান পাওয়া গেছে।

—কোথায় সেই ডাক্তার? আমায় সত্যি করে বল।

লোকটি হাঁফাতে হাঁফাতে উত্তর দিলে, সাহেব দক্ষিণেশ্বরে। স্বরদাস অবাক হয়ে গেল।

—অ্যাঁ! বলিস কিরে? সাহেব দক্ষিণেশ্বরে? সেখানে সাহেব কি করছে?

লোকটি উত্তর দিলে, সাহেব মন্দিরের সামনে বসে ধ্যান করছে। স্বরদাসের মুখ দিয়ে যেন কথা বেরুতে চায় না।

—কী তাজ্জব ব্যাপার! বিদেশী সাহেব ডাক্তার দক্ষিণেশ্বরে বসে ধ্যান করছে? এ কথা বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে?

লোকটি আবার দুই চোখ বড় বড় করে উত্তর দিলে, আমি সত্যি কথাই বলছি দাদাবাবু। ফেরার পথে ভাবলাম, দক্ষিণেশ্বরে একবার যাই। ওখানে গিয়ে দেখি—সাহেব মায়ের মন্দিরের সামনে বসে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছে।

স্বরদাস উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল।

—চল আমার সঙ্গে। এক্ষুণি ট্যাক্সি করে আমি দক্ষিণেশ্বরে যাবো। সাহেবকে ধরতে হবে।

তাড়াতাড়ি দুইজনে বেরিয়ে গেল।

গভীর রাত।

কেউ কোথাও নেই। স্বরদাসের ট্যাক্সি দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণেশ্বরের দিকে।

রাস্তা খালি বলে গাড়ির গতিও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। স্বরদাস ওখানে পৌঁছে দেখল, লোকটি মিথ্যে কথা বলে নি। সায়েব ডাক্তার সেই মায়ের মন্দিরের সামনে বসে ধ্যান করছে।

স্বরদাস একেবারে উন্মাদের মত সাহেবের সামনে এসে হাজির হল।

সে আরো আশ্চর্য হল যে ডক্তোরের দুই চোখ জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

সুরদাস ভাবলে, ডাক্তার মায়ের কাছে কি মিনতি জানাচ্ছে? তারা এক ধর্মের মানুষ নয়, তবু এই দূরদেশে এসে হিন্দুর প্রাঙ্গণে ডাক্তারের এ কী আকুলতা?

সুরদাস সব লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে চিকিৎসকের পায়ের ওপর পড়ল।

—আমি মায়ের নামে ভগবানের নামে মিনতি করছি- আপনি আমার বন্ধুর চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিন।

চিকিৎসক চোখ মেলে তাকালেন। তারপর অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলেন।

বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি তোমার বন্ধুর চোখ অপারেশনের জন্য এসেছ। আমি এখানে আছি তুমি কি করে খবর পেলে?

সুরদাস বললে, আমার ভগবানই আমাকে হদিস দিয়েছেন। চিকিৎসক, মানুষের রোগ নিরাময় করাই আপনার কাজ। যে বিদ্যা আপনি সারাজীবনের সাধনায় আয়ত্ত করেছেম, তা পরের হিতে নিয়োজিত করুন।

প্রবীণ চিকিৎসক ধ্যানমগ্নের মতো বললে, দেখ বালক যৌবনে আমি এক অপরাধ করেছিলাম। পরবর্তী জীবনে আমার অনুশোচনার সীমা থাকে না। তখন একদিন আমি গঙ্গাতীরের এই মন্দিরের স্বপ্ন দেখি পর পর তিন দিন। তাই আমি সুদূর ভিয়েনা থেকে তোমাদের ভারতভূমিতে এসেছি। ভগবান আমায় ক্ষমা করেছেন। বল কিশোর বালক, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?

সুরদাস উত্তর দিলে, আপনি আমার বন্ধুর চক্ষুর অস্ত্রোপচার করুন। তাহলে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। তার জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে না। আমিও ভগবানের নির্দেশ পেয়েছি।

প্রবীণ চিকিৎসক দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি ভগবানের ক্ষমা

পেয়েছি। তাই তোমার অনুরোধ রক্ষা করবো। চল মেডিকেল কলেজে। কাল সকালেই অপারেশন হবে।

ইতিমধ্যে বহু প্রতিষ্ঠান সকাল থেকে সুরদাসকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্টুডিওর লোক এসে বললে, আজ খুব জরুরি সুটিং। পরিচালক আপনাকে আমায় নিতে পাঠিয়েছেন

সুরদাস উত্তর দিলে, আজ আমার বন্ধুর অপারেশন। আজ ত আমি কিছুতেই যেতে পারবো না।

বেতার কেন্দ্রের প্রতিনিধি এসে জানালো, আজ একটা ভাটিয়ালী গান আপনাকে গাইতে হবে। আপনি এক্ষুণি চলুন।

সুরদাস জবার দিলে, আজ আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। আপনি আমায় ক্ষমা করুণ।

বিদেশী ডাক্তারের দ্রুত ব্যবস্থায় সকালবেলাতেই চিত্রকের চোখের অপারেশন হল।

চিকিৎসক সুরদাসকে ডেকে বললেন, সন্ধ্যাবেলা তুমি আসবে। তখন বন্ধুকে দেখতে পাবে। এখন বাড়ি যাও।

সারাদিন ধরে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে সুরদাস ঠিক সন্ধ্যার মুখে এসে মেডিকেল কলেজে হাজির হল।

আর সেই মুহূর্তেই প্রবীণ চিকিৎসক চিত্রকের চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

উন্মুখ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চিত্রক। তার চোখের ওপর দুটি নত অশ্রুজল আঁখি।

সেই আঁখির ভাষা কি চিত্রক পড়তে পারল? একদিন যে চোখের দিকে ঘৃণায় চিত্রক চাইতে পারত না।

তাই আজ অশ্রুজসল হয়ে শুকতারার মতো জেগে আছে।

মুখ দেখে কি মানুষ চেনা যায়?

—সমাপ্ত—